অস্তিবাদী পটভূমিকায় নৈতিকতার অর্থ : সিমন দ্য বোভায়ার অনুসৃত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনশাস্ত্রে এম.ফিল. উপাধি প্রাপ্তির আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত

বর্ষ : ২০১৮-২০১৯

তনিমা ধর

দর্শন বিভাগ

পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা – MPPH194019

রেজিস্ট্রেশন নং : 115423 of 2011-2012

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

মে, ২০১৯

Certified that thesis entitled, **অস্তিবাদী পটভূমিকায় নৈতিকতার অর্থ : সিমন দ্য বোভায়ার অনুসৃত** submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in philosophy of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree /diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/ conference at Jadavpur University, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil. Regulation (2017) of Jadavpur University.

Tanima Dhar.
Roll no- MPPH194019
Registration no - 115423 of 2011-12

Name of the M.Phil. Student with

Roll number and Registration Number

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Tanima Dhar entitled অস্তিবাদী পটভূমিকায় নৈতিকতার অর্থ: সিমন দ্য বোভায়ার অনুসৃত, is now ready for submission towards the partial fulfillment of Degree of Master of Philosophy (Arts) in Philosophy of Jadavpur University.

P. Sarkar. 14/05/19
Head

Department of philosophy

Head
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Jhuma Chakraborty 14.5.19
Supervisor & Convener of RAC

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Aparajita Mukhopadhyay 14.5.19.
Member of RAC

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Certified that thesis entitled, **অস্তিবাদী পটভূমিকায় নৈতিকতার অর্থ : সিমন দ্য বোভায়ার অনুসৃত** submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Tanima Dhar of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree /diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/ conference at Jadavpur University, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil. Regulation (2017) of Jadavpur University.

Name of the M.Phil. Student with

Roll number and Registration Number

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Tanima Dhar entitled অস্তিবাদী পটভূমিকায় নৈতিকতার অর্থ: সিমন দ্য বোভায়ার অনুসৃত, is now ready for submission towards the partial fulfillment of Degree of Master of Philosophy (Arts) in Philosophy of Jadavpur University.

Head Supervisor & Convener of RAC Member of RAC

Department of philosophy

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার নিবন্ধ পত্রের মূল আলোচ্য বিষয় “অস্তিবাদী পটভূমিকায় নৈতিকতার অর্থ: সিমন দ্য বোভায়ার অনুসৃত”। এই নিবন্ধ পত্রের সম্পূর্ণ আলোচনা এক বছরের পরিসরে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ঝুমা চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে থেকে করতে সমর্থ হয়েছি। তিনি তাঁর অমুল্য সময় ব্যয় করে আমাকে পড়িয়েছেন, বুঝিয়েছেন। ঠিক কীভাবে নিজেকে তৈরী করলে আমি আমার লক্ষ্যে উপনীত হব তার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তাই তাঁর প্রতি আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রয়াস সরকারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এর সাথে দর্শন বিভাগের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা বিশেষত প্রাক্তন অধ্যাপিকা শেফালী মৈত্রের প্রতি আমার সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও আমি বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তারা আমাকে বিভিন্ন পুস্তকের সন্ধান দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তারসাথে আমি আমার পরিবারের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমি আমার মা ও বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ , তাঁদের সহযোগিতা এবং অক্লান্ত মনোবল প্রদান আমাকে আমার কার্যসম্পাদনে সাহায্য করেছে। এছাড়াও আমার সহপাঠীরা এবং দাদা-দিদিরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছে তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।

দর্শন বিভাগ, তনিমা ধর

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২ ১৫ই মে’২০১৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা 1-7

প্রথম অধ্যায় :-> নারীবাদী দর্শন : প্রেক্ষাপট ও পরিব্যপ্তি 8-26

দ্বিতীয় অধ্যায় :-> অস্তিবাদী দর্শন : সার্ত্রে ও সিমন দ্য বোভায়ার..... 27-63

তৃতীয় অধ্যায় :-> নৈতিকতা : 'অনিশ্চিত' নৈতিকতা 64-101

উপসংহার 102-105

গ্রন্থপঞ্জী 106-108

ভূমিকা

আমার গবেষণা পত্রটি নারীবাদ সংক্রান্ত। যে প্রশ্নটিকে ঘিরে এই গবেষণা পত্রের উদ্ভাবন সেটি হল: 'নৈতিকতা' এবং 'অনিশ্চয়তা' বা অস্পষ্টতা কিভাবে সহাবস্থান করতে পারে? বা নৈতিকতার মানদণ্ড হিসাবে যদি 'অনিশ্চয়তাকে' ধরা হয় তবে কি আদৌ নৈতিক তত্ত্ব পাওয়া যায়? এই গবেষণা পত্রটি ফরাসী দার্শনিক সিমন দ্য বোভায়ারের *The Ethics of Ambiguity* অনুসারে লেখা।

সিমন দ্য বোভায়ারের জন্ম ১৯০৮ সালে, প্যারিসে। শৈশব থেকে সিমন দুটি ভিন্ন ভাবধারার মধ্যে নিজেকে গড়ে তোলেন। কারণ সিমনের পিতা ছিলেন নাস্তিক এবং মাতা ছিলেন কট্টর খ্রিস্টীয় ভাবধারার বশবর্তী। ফলে সিমনের জীবনশৈলীতে দুটি বিপরীত ভাবের মিশ্রন ঘটে। তাই শৈশব থেকে তিনি ছিলেন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় 'A Dutiful Daughter' বা 'কর্তব্যনিষ্ঠ কন্যা'। যেহেতু তিনি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেছিলেন তাই শৈশব থেকে তাঁর বিনোদনের সাথী ছিল বই এবং পড়ার প্রতি একাগ্রতা। তবে সিমন চৌদ্দ বছর বয়েসে 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই' ঘোষণা করেন এবং আজীবন সেই মতে অটল থাকেন।

সিমনের জীবনের কয়েকটি পর্ব স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্ব শুরু হয়, তাঁর জন্মের সাথে সাথে। পূর্বেই উল্লখ করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় একজন 'Dutiful Daughter' বা 'কর্তব্যনিষ্ঠ কন্যা'।

তখনও তিনি পিতৃতান্ত্রিক ভাবধারার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন নি। শৈশবে যখন তাকে কোনো কাজ করতে বাধা দেওয়া হত তখন তিনি মনে করতেন যে যেহেতু তিনি ছোটো তাই সে এখনও সেই কাজের উপযুক্ত নয় বলে তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ফলত তিনি তখনও পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না।

সিমনের জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত হয় সার্ত্রের সাথে আলাপ হওয়ার পর, ১৯২৮ সালে। তখন তারা 'অ্যাগ্রেশিয়োঁ' নামক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঐ পরীক্ষায় সার্ত্র প্রথম স্থান এবং সিমন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর সার্ত্রের সাথে ঘনিষ্টতা, আজীবন 'Essential Relationship'-এ থাকা যা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ককে নাকচ করেও একধরনের সম্পর্ক। সার্ত্রের সাথে সম্পর্ক, নিজের পড়াশুনা, অধ্যাপনা, ইত্যাদি নিয়ে তাঁর জীবন যেন একটি সরলরেখায় চলছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেন তাঁর জীবনে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই পর্যায়েই তিনি নিজেকে অস্তিবাদী দার্শনিক রূপে ঘোষণা করেন এবং সারাজীবন এই ভাবধারায় অবিচল থাকেন।

তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, মানুষের স্বাধীনতা বহুলাংশে নির্ভর করে তার অবস্থানের উপর, অর্থাৎ এই পর্যায়ে তিনি মানব জীবনে ইতিহাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। দ্বিতীয় পর্বেও তিনি লিঙ্গ রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি তৃতীয় পর্বে 'স্বাধীনতার' একটি অস্তিবাদী ব্যাখ্যা দেন এবং লিঙ্গ রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। এই পর্বেই প্রকাশিত হয় তাঁর বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থ ***ল্য দোজিয়েম্ সেক্স*** – যার ইংরাজি তর্জমা হয় *The*

Second Sex (১৯৪৯)। *The Ethics of Ambiguity* (১৯৪৭)-ও এই পর্যায়ের লেখা। বলা যায় যে সিমনের তৃতীয় পর্যায়টি তাঁর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় তিনি কিছু পুরস্কার পান।

সিমনের জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে তিনি স্পষ্ট ভাবে বার্ধক্যের যাপিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের জানান। এই পর্যায়ের উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হল ১৯৮০ সালে সার্ত্রের মৃত্যু। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। সার্ত্রের মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত হন। *অ্যাদিউ: আ ফেয়ারওয়েল টু সার্ত্র* (১৯৮১) এই বইটি ছিল বার্ধক্য বয়েসে সার্ত্র কিভাবে রোগের সাথে মোকাবিলা করেছেন তার সম্পর্কে।

সিমন নিজেকে দার্শনিক বলতে সম্মত ছিলেন না। তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন যে, তিনি কেবল সার্ত্রের দার্শনিক ভাবনাকে অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। সিমনের অনুগামীরা এই কথাতে অসম্মতি জানান। তিনি যে একটি নতুন দর্শনের সৃষ্টি করেছিলেন তা হলফ করে বলা যায়।

উক্ত গবেষণা পত্রটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে, নারীবাদী দর্শনের উৎপত্তি কেন হল এবং কীভাবে তা দর্শনের পর্যায় ভুক্ত হল তার আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সাথে নারীবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিভিন্ন দেশে নারীবাদ বহুল আলোচিত বিষয়ের মধ্যে একটি। ১৯৭০-এর দশক থেকে নারীবাদ ক্রমশ তার স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করে। ইতিপূর্বে নারীবাদ কেবল অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

ইংল্যান্ডের অধিবাসী মেরী ওলস্টোনক্রাফ্টের (১৭৫৯-১৭৯৭) হাত ধরে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তিনিই প্রথম নারীদের নানা সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তৎকালীন সমাজে এই আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল নারীদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্য মূলক আচরণ। তিনি মেয়েদের অধিকারের সমর্থনে *A Vindication of Rights of Woman* (১৭৯২) শীর্ষক একটি বই লেখেন। কিন্তু তা পরিস্থিতি ও চার্চের চাপে নিষিদ্ধ হয়। তাঁকে নানা ভাবে অপদস্তও করা হয়। তবে তিনি যে নারীবাদী তরঙ্গের সূচনা করেছিলেন সেই সময় তাকে সাময়িকভাবে রোধ করা গেলেও বিনষ্ট করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীকালে তা পুনরায় স্বমহিমায় নিজেকে প্রকাশ করে।

এর পরবর্তীতে দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) The *Subjection of Women* (১৮৬৯) শীর্ষক একটি বই লেখেন, কিন্তু সেই বইও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়। এর পরবর্তীকালে নারীবাদের নানা উত্থান পতন ঘটে। কখনো কখনো নারীবাদ তার নিজের ছন্দ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ১৯৭০ এর দশকে নারীবাদ পুনরায় উজ্জীবিত হয়। এই সময়ই নারীবাদ দর্শনের উদ্ভব হয়।

নারীবাদী দর্শন উদ্ভবের তিনটি পর্যায় স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে নারীবাদ কেবল অধিকার আদায়ের আন্দোলন ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে আধিকার আদায়ের আন্দোলনের পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে যৌনস্বরূপ (Sex) ও লিঙ্গস্বরূপের (Gender) হাত ধরে কীভাবে নারী পুরুষের পার্থক্য বৈষম্যতে পরিনত হয়। বলা বাহুল্য যে, নারীবাদ যে কোনো রকম বৈষম্য বিরোধী। তৃতীয়

পর্যায়ে নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মূল প্রয়াস ছিল কীভাবে বিভিন্ন তত্ত্বকে লিঙ্গ রাজনীতি প্রভাবিত করে তার প্রতি আলোকপাত করেন। নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মূল দাবী একই অর্থাৎ বৈষম্যের বিরোধিতা করা। কিন্তু এই দাবী আদায়ের পদ্ধতিকে অবলম্বন করে নারীবাদকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়, উদারনৈতিক নারীবাদ এবং চরমপন্থী নারীবাদ এবং সিমন দ্য বোভায়ার নিজেকে চরমপন্থী নারীবাদী বলতে বেশী পছন্দ করতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, অস্তিবাদী ভাবধারা কীভাবে মূলস্রোতের দর্শনের অন্তর্গত হল তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা। এর কারণ হল সিমন দ্য বোভায়ার ছিলেন অস্তিবাদী দর্শনের অন্যতম প্রধান চরিত্র। তাই অস্তিবাদী দর্শন কীরূপে মূলস্রোতের দর্শনে স্থান করেছিল তা বলা আবশ্যক মনে হয়েছে।

সাধারনত অস্তিবাদী দর্শন বলতে জাঁ-পল-সার্ত্রের (১৯০৫-১৯৮০) দর্শনকে বোঝানো হয়। অস্তিবাদী দর্শনের মূল কথা হল পূর্ব-নির্ধারিত সকল বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি। সিমনও এই মতের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। তবে সিমন অস্তিবাদী কাঠামোকে অবলম্বন করে অস্তিবাদী নারীবাদী দর্শনের প্রবক্তা বলে চিহ্নিত হন। সর্বোপরি সার্ত্রের দর্শনের সাথে তাঁর দর্শনের পার্থক্যও এই অধ্যায়ে সূচিত হয়েছে। যদিও সিমন নিজে মনে করতেন যে, তিনি কেবল সার্ত্রের দার্শনিক ভাবধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন মাত্র, নতুন কোনো দর্শনের সূচনা করেন নি। কিন্তু সিমনের এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সার্ত্র স্বাধীনতার চরম অর্থ গ্রহন করেছেন এবং মনে করতেন যে ব্যক্তির প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে অবস্থান

কোনোরূপ ভূমিকা পালন করে না। কিন্তু সিমন মনে করতেন যে, ব্যক্তির অবস্থান প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মানদণ্ড। এমনকি দেহের ভূমিকা কি এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সার্ত্রে এবং সিমনের অবস্থান আলাদা। সিমনের অনুগামীরা মনে করেন যে, সার্ত্রের দর্শনে ঐকাগ্র্য ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে, অপরদিকে সিমন সর্বদা ঐকাগ্র্যব্যক্তি (Serious Man) বিরোধী। তিনি তাঁর দর্শনে মেয়েদের যাপিত অভিজ্ঞতাকে স্থান দিয়ে অস্তিবাদকে নারীবাদের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় হল কীভাবে অস্তিবাদী ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। বর্তমান সমাজ ব্যব্যস্থার নিরিখে 'নৈতিকতা' কী তা একটি গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন। নৈতিকতা সম্পর্কিত নানা তত্ত্ব আছে। তাহলে প্রশ্ন হল সিমন দ্য বোভায়ারের নৈতিকতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ কি? সিমন দ্য বোভায়ার বলছেন যে, এমন নয় যে আমাদের অস্তিত্ব এবং অনিশ্চয়তা দুটি আলাদা বিষয়। বরং আমাদের অস্তিত্বই অনিশ্চিত। তাই সেই অনুসারে নৈতিকতা করলে তাও অনিশ্চিত হতে বাধ্য। তিনি *The Ethics of Ambiguity* (১৯৪৭) বইতে তথাকথিত নৈতিকতাকে নাকচ করেছেন এবং বলেছেন যে, নৈতিকতা কোনো তৈরী করা বিষয় হতে পারে না, বরং নৈতিকতা আমাদের কয়েকটি পথের সন্ধান দিতে পারে মাত্র। যেহেতু তিনি অস্তিবাদী কাঠামোকে অবলম্বন করে নৈতিকতার অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন, ব্যক্তির স্বাধীনতা, পরিস্থিতি ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তাই মনে হতে পারে যে, তিনি পরিস্থিতি সাপেক্ষ নৈতিকতা করছেন। কিন্তু তাঁর নৈতিক অবস্থান পরিস্থিতি

সাপেক্ষ নৈতিকতা থেকে স্বতন্ত্র। পরিস্থিতি সাপেক্ষ নৈতিকতায় নৈতিক কর্তা এবং নৈতিক কাজকে আলাদা করা যায়। অর্থাৎ নৈতিক কাজ ও কর্তার মধ্যে একটা স্পষ্ট ভাগ লক্ষ্যনীয়। অপরদিকে সিমনের নৈতিক অবস্থানে এই বিভাজনটি কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। কেননা তিনি 'আমার কাজ' (My Project) বলার তুলনায় 'আমাদের কাজ' (We Project) বলাতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ফলে কে নৈতিক কর্তা এবং কোনটি নৈতিক কাজ তার এই রকম স্পষ্ট বিভাজন করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি, 'অনিশ্চিত' শব্দটির ভুল অর্থ বোঝার দরুন মনে হয় যে, অনিশ্চিত (Ambiguity) এবং নৈতিকতা পাশাপাশি সহাবস্থান করতে পারে না। অনিশ্চিতকে অসম্ভবের (Absurdity) সাথে এক করে ফেললে হবে না। 'অনিশ্চিত'-এর অর্থ হল যার নির্দিষ্ট কোন অর্থ নেই, প্রতিনিয়ত যার অর্থ অর্জন করতে হয়।

উপসংহারে নৈতিকতা ও অনিশ্চয়তা কিভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে তার প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

নারীবাদী দর্শনঃ প্রেক্ষাপট ও পরিব্যাপ্তি

১) ভূমিকাঃ-> সম্প্রতিককালে নারীবাদ একটি বহুল বা জনপ্রিয় শাস্ত্র হয়ে উঠেছে পৃথিবী জুড়ে – উন্নত ও উন্নতশীল উভয় দেশেই। তবে নারীবাদ সংক্রান্ত আলোচনার উৎপত্তি হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডবাসী মেরী ওলস্টোনক্রাফ্টের (Mary Wollstonecraft, 1759-1797) হাত ধরে। নারীবাদ সংক্রান্ত প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, নারীবাদ হল, 'কেবলমাত্র নারী সংক্রান্ত আলোচনা' অর্থাৎ সেই আলোচনাই পুরুষ হল ব্রাত্য। যদি এই ব্যাখ্যাই ধরা হয় তবে একটি প্রশ্ন ওঠে, প্রশ্নের আকারটি এরূপ – সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে মানব শ্রেণী দুভাগে বিভক্ত, যথা – নারী ও পুরুষ। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সেখানে নারী পুরুষের স্বভাব, কার্যকলাপের স্পষ্ট বিভাজন ছিল। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বা তার পূর্বে এমন কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যে নারী সংক্রান্ত স্বতন্ত্র তত্ত্বের বা শাস্ত্রের উদ্ভব হল বা করতে হল? 'নারীবাদ' কেবল 'নারী সংক্রান্ত আলোচনা' – এই মতের সমর্থকরা এই প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'নারীবাদ' কেবলমাত্র 'নারীসংক্রান্ত' আলোচনা নয় তা ক্রমশ আলোচ্য।

১.১) যৌনস্বরূপ ও লিঙ্গস্বরূপঃ-> নারীবাদী আলোচনার সূত্র ধরে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নারীবাদের মূল আলোচ্য বিষয় পার্থক্য (Difference) নয় বরং বৈষম্য (Discrimination)। নারী ও পুরুষের পার্থক্য হল প্রাকৃতিক (Natural), কিন্তু বৈষম্য হল সমাজসৃজিত (Constructed)। এই প্রসঙ্গে অধিকাংশ নারীবাদীরা সহমত প্রদর্শন করেন। নারীবাদীরাই প্রথম যৌনস্বরূপ (Sex) ও লিঙ্গস্বরূপের (Gender) মধ্যে ভেদ দেখায়। ইতিপূর্বে তা সমগোত্রীয় বলেই মনে করা হত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 'যৌনস্বরূপ' বলতে বোঝায় যৌনাঙ্গের প্রভেদ, যা প্রাকৃতিক। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মধ্যে যে দৈহিক পার্থক্য তা প্রাকৃতিক। স্থান নির্বিশেষে তা অপরিবর্তনীয়। তবে যৌনস্বরূপের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের কর্মের যে পার্থক্য সূচিত হয় যা লিঙ্গস্বরূপ নামে পরিচত এবং তা সমাজসৃজিত। স্থান বিশেষে লিঙ্গস্বরূপ পরিবর্তিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, যৌনস্বরূপ হল প্রকৃতি নির্ধারিত এবং লিঙ্গস্বরূপ হল সমাজসৃজিত। লিঙ্গস্বরূপ হল বৈষম্যের দ্যোতক যা ক্ষমতার অসমবন্টনের সাথে যুক্ত। বিদিশা মুখার্জী তাঁর *Redefining Ethics as Care* নামক গ্রন্থে বলেছেন,

It is obvious that human eyes wishes to gratify itself in a way different from crude non-human eye of the social structure in which she/he lives in. Every individual nurtures the dream that she or he will be treated equally in all matters in a society..... We have seen through ages that

women have been discriminated against on biological, sexual, economics, and social and several other grounds.[1]

সাধারণত অধিকাংশ সমাজেই মনে করা হয় যে, নারীর গৃহকর্ম সম্পাদন করা উচিত এবং পুরুষ কাজ হল বহির্মুখী বা উপার্জন ভিত্তিক। বলা বাহুল্য, উক্ত গবেষণা পত্রে 'যৌনস্বরূপ' এবং 'লিঙ্গস্বরূপ' বলতে প্রচলিত ধারনাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা প্রথমে যৌনস্বরূপ নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রসঙ্গে Havelock Ellis এর মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

Havelock Ellis (1859-1939) categorized three level of sex-linked difference:

A) primary differences characterized by differences in sex organ;
B) Secondary differences characterized by differences associated with reproductive function, e.g., breast, body hair etc.
C) Tertiary differences characterized by differences in behavior, e.g. aggression, care, assertion, submission..... tertiary sexuality traits overlap with gender. While sex is a biological category, gender is a cultural category.[2]

[1] Mukherjee, Bidisha. 2008. *Redefining Ethics as Care.* Kolkata: Papyrus. P.9.

[2] Moitra, Sefali. 2002. *Feminist Thought.* Kolkata: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. P.7-8.

পার্থক্য কিভাবে বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটায় তার কিছু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

১.২) প্রাগৈতিহাসিক ব্যাখ্যাঃ-> কমলা বাসীনের আলোচনা অনুসারে, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদি লগ্ন থেকেই মানব সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা – নারী ও পুরুষ (যদিও সমাজে তিন শ্রেণীর মানুষ দেখা যায় যথা- নারী, পুরুষ, তৃতীয় লিঙ্গ। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় শুধু নারী এবং পুরুষ আছে, তৃতীয় লিঙ্গের কোনো স্থান নেই)। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন-যাপন করত। তারা বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করত এবং গোষ্ঠীর পরিধি বৃদ্ধি করত। গোষ্ঠী বৃদ্ধির একমাত্র উপায় বা পন্থা ছিল সংঘর্ষ। জৈবিক (Biological) কারণে নারী গর্ভধারণে সক্ষম। সমাজবিজ্ঞানের একটি সর্বজন স্বীকৃত মতবাদ হল সমস্যার সূত্রপাত সেইখানেই। হিংস্রতা ও বর্বরতার দরুন সংঘর্ষের সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে পরাজিত করাই ছিল মূল লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার হত বিশেষত গর্ভধারণ করা মহিলা এবং শিশুরা। ফলে গর্ভধারণ করা মহিলা ও শিশুদের নিয়ে গোষ্ঠীযুদ্ধে অংশগ্রহন করা ছিল সমস্যাজনক। এর সাথে কিছু আনুষাঙ্গিক কারণ যেমন – বৃষ্টিপাত, দাবানল, হিংস্র পশুর আক্রমন ইত্যাদি থেকে বাঁচার তাগিদে মানুষ গুহাবাসী হয়। শারীরিক কারণে মেয়েদের সাথেই সন্তানের সংযোগ বেশি থাকে তাই মেয়েরা গুহাতে থাকাটাই সুবিধাজনক বুঝতে পেরে গুহাতে থাকাতে সম্মত হয় এবং পুরুষ বহির্মুখী হয় খাদ্যসংগ্রহ ও শিকারের তাগিদে।

মেয়েরা সন্তানের জন্ম দেয় বলে মাতৃত্বই তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য এবং সন্তান ধারন ও পালনই তাদের মুখ্য দায়িত্ব। অপরদিকে পুরুষ অধিক শক্তিশালী হওয়ার ফলে শিকারী, অন্নদাতা ও যোদ্ধা হতে পারে।[3]

এরই সূত্র ধরে প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ে শ্রমবণ্টন বা শ্রমবিভাজনের সূত্রপাত হয়।

১.৩) মার্ক্সসীয় ব্যাখ্যাঃ-> মার্ক্সসের ব্যাখ্যাও তদানুরূপ। অর্থাৎ মার্ক্সও মনে করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য ছিল না। তাহলে যে প্রশ্নটি মনে জাগে সেটি হল: বৈষম্যের সূত্রপাত কি করে বা কবে থেকে? ফ্রেডরিক এঙ্গেলস *Origins of the Family, Private Property and State* (১৮৮৪) বইয়ে বৈষম্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন,

ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রসারের সময়ই নারীর বশ্যতার শুরু হয়। তাঁর মতে 'সারা দুনিয়ায় স্ত্রী জাতির পরাজয় ঘটে'।[4]

তাই বলা যায় যে, নারী বশ্যতার একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। পুনরায় মার্ক্সসের ব্যাখ্যানুসারে,

পুরুষ পশুপালন আরম্ভ করার পর ক্রমশ গর্ভধারণ সম্পর্কে তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। তারা বড় শিকারের জন্য নতুন অস্ত্র গড়তে শুরু করে, যা পরবর্তীকালে গোষ্ঠী অন্তর্দ্বন্দ্বেও ব্যবহৃত হতে থাকে। এই সময় থেকে ক্রীতদাস প্রথার শুরু। গোষ্ঠীগুলো পশু ও ক্রীতদাস সংগ্রহ করতে শুরু করে – বিশেষত ক্রীতদাসী। এর ফলে নারী পুরুষের মধ্যে বিভেদ আরও বেড়ে যায়। পুরুষের

---

[3] ভাসীন, কমলা, ১৯৯৫, *পিতৃতন্ত্র কাকে বলে?,* দেবারতি সেনগুপ্ত, পারমিতা ব্যানার্জ্জি অনুবাদিত, কলকাতা: স্ত্রী, পৃ.২০।

[4] তদেব, পৃ.২।

আধিপত্য এইভাবেই বিস্তৃত হতে শুরু করে এবং পশু ও ক্রীতদাসের ওপর পুরুষের মালিকানা বৃদ্ধির সূত্রে তাদের ধনও বাড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়াতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে, পুরুষ ক্ষমতা ও সম্পত্তি নিজের হাতে রেখে তা সন্তানদের হাতে তুলে দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। উত্তরাধিকার প্রথা বলবৎ করার জন্য মাতৃস্বত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। পিতৃস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারীকে গৃহমুখী ও গৃহবন্দী করে ফেলা হয় এবং তার যৌনতা নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত হয়। এঙ্গেলসের মতে, এই যুগ থেকেই পিতৃতন্ত্র ও নারীর এক-বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়।[5]

১.৪) আধুনিক সমাজের নিরিখে এই মতের বাস্তবতাঃ-> 'পরিবার' এই ধারণার উদ্ভবের সাথে সাথে সুষ্ঠুভাবে পরিবার পরিচালনার জন্য শ্রমবিভাজন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পরিবারের 'কর্তা'-রা নিজেদের মধ্যে কাজগুলিকে ভাগ করে নেয়। পূর্বেই উল্লিখিত যে, জৈবিক (Biological) কারণে নারীর সাথে সন্তানের বন্ধন তুলনামূলক বেশি। ফলে নারী সন্তান লালন পালনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করে এবং পুরুষ বহির্মুখী কর্মসম্পাদনে উদ্যোগী হয়। অর্থাৎ নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, শ্রমবিভাজনের উৎস হল সুষ্ঠুভাবে পরিবার পরিচালনা। মার্ক্সের ব্যাখ্যানুসারে,

উদ্বৃত্ত উৎপাদনের এলাকাগুলি এই সময় থেকে পুরুষের নিয়ন্ত্রনে চলে যাওয়ার ফলে নারী অর্থনৈতিক ভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এঙ্গেলস্ মনে করেন, আধুনিক সমাজের ভিত্তি হল সম্পত্তির উত্তরাধিকার হস্তান্তরের জন্য সন্তান উৎপাদনের লক্ষ্যে নারীকে গৃহবন্দী করে রাখা।..... সেখানে স্ত্রীর গৃহশ্রম 'ব্যাক্তিগত কাজ বলে গণ্য হয় এবং সে প্রধান দাসীতে পরিনত হয়'।[6]

[5] তদেব, পৃ.২২।

[6] তদেব, পৃ.২২।

সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে নারী নির্যাতনের রূপও পরিবর্তিত হতে থাকে। দাসপ্রথার পরিমার্জিত রূপ সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রথা। মধ্যযুগে সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রথা ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের দরবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বলা বাহুল্য, সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রথা ভূমিকেন্দ্রিক। ভূমি বা জমিকে কেন্দ্র করে এই প্রথার উদ্ভব হয়। ফসল উৎপাদনে 'সামন্ত্র'-দের কোনো ভূমিকা ছিল না। ভূমিদাসরা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত কিন্তু উৎপাদিত ফসলে তাদের কোন ভাগ থাকত না। তারা কেবলমাত্র 'সামন্ত্র'-দের আজ্ঞাবহ রূপেই পরিচিত ছিল। এই প্রথার প্রভাব নারীর জীবনেও পড়েছিল। একদিকে 'সামন্ত্র'-দের অত্যাচার এবং অপরদিকে পারিবারিক নির্যাতন নারীর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সময় বিশেষে পুরুষের সহকর্মী হিসাবে নারী ও শিশুর শ্রম ব্যবহৃত হত।

যুগে যুগে বিভিন্ন ভাবে নারী ব্যবহৃত হতে থাকে পুরুষের স্বার্থে। যেমন, ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে উপার্জনভিত্তিক কাজের প্রতুলতা অপরদিকে ঔপনিবেশিকতার বিস্তার ও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহনের ফলে সৈন্যের অপ্রতুলতার প্রভাব তৎকালীন নারীর জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সৈন্যের অপ্রতুলতার দরুন জনসাধারণকে (পুরুষ) সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। ইতিপূর্বে গৃহকর্মই কাজই ছিল নারীর প্রধান কাজ। পুরুষ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর সংসার বা পরিবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে তারা বহির্মুখী বা উপার্জনভিত্তিক কাজ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ গৃহকর্ম ও উপার্জনভিত্তিক কর্ম

– উভয় ক্ষেত্রেই তাকে লিপ্ত হতে হয়। এমতাবস্থায় যুদ্ধ শেষে সৈন্যদল দেশে ফিরে এলে নারীকে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। তার কারণ হল,

কিছু পুরুষ ভয় পায় নারীর প্রতিদ্বন্দ্বীতাকে। সম্প্রতি এক ছাত্র 'হেবেডা লাটিন'-এ লিখেছেন, 'প্রতিটি ছাত্রী যে চিকিৎসাবিদ্যা বা আইন পড়ে, হরণ করে আমাদের একটি করে চাকুরী'।[7]

এই যুক্তির অজুহাতে নারীকে পুনরায় গৃহবন্দীর প্রচেষ্টা চলে। অর্থাৎ নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারকে হরণ করে নারীকে বদ্ধ করা হয় অর্থনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলে। পুরুষের স্বার্থ অনুযায়ী নারী ব্যবহৃত হতে থাকে।

সাধারণত সমাজে উপার্জনভিত্তিক (অর্থ) কর্মকে 'যথার্থ কর্ম' বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং অন্যান্য কর্ম (উপার্জন ভিত্তিক নয়) 'যথার্থ কর্ম'-এর পরিসর থেকে ব্রাত্য। এই প্রসঙ্গে নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

আমি যখন ১৯৭০ সালে লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে প্রথম কাজ করি, তখন দেখে প্রায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে বহু ব্যবহৃত Handbook of Human Nutrition Requirement বইটিতে ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকেদের 'ক্যালোরির প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গৃহকর্মকে বেছে নেওয়া হয়েছে একটি 'পরিশ্রমহীন কাজ' হিসাবে, যাতে নাকি খুব সামান্য শক্তির দরকার হয়ে থাকে।[8]

---

[7] সিংহ, কিংকর, ২০১৪, *দ্বিতীয় লিঙ্গ : সিমন দ্য বোভয়ার* , কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, পৃ.২২।

[8] সেন, অমর্ত্য, ২০০৭, *তর্কপ্রিয় ভারতীয় : ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরিচিতি সংক্রান্ত প্রবন্ধমালা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ.২২৫-২২৬।

সুতরাং সামাজিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'শ্রমবিভাজন' পরিনত হল 'শ্রমবৈষম্যে'।

১.৫) নারীবাদী তত্ত্বের উদ্ভবঃ-> নারীবাদী তত্ত্বের আপত্তির স্থান এইটিই। শ্রমবিভাজনের নামে শ্রমবৈষম্য অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক অধিকারের দাবীতে সর্বপ্রথম সরব হন মেরী ওলস্টোনক্রাফ্ট (Mary Wollstonecraft)। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর বিখ্যাত *A Vindication of the Rights of the Woman* (1792) নামক বইতে তিনিই প্রথম দেখান যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী কিভাবে বঞ্চিত। অর্থাৎ তাঁর বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অধিকার আদায়। তিনি মেয়েদের অসহায়তার কথা বলেছেন। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই সমস্ত অধিকার আদায় সফল হয় নি। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

নারী সমান অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম করছে অথচ সে সর্বতোভাবে তার সংগ্রামী শক্তি হারিয়েছে – তার শিক্ষা নেই, রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই – সে সংসারের দায়ভারে ক্লিষ্ট! তিনি মনে করেছিলেন এমন নির্বল গোষ্ঠীর প্রতিবাদ পরিণামহীন হওয়ার সম্ভবনা বেশি।[9]

ব্যর্থতার পাশাপাশি বইটি চার্চের চাপে নিষিদ্ধ হয় এবং তাঁকে বিভিন্ন ভাবে অপদস্তও করা হয়। এমনকি কুরুচিকর অপবাদও দেওয়া হয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি যে নারীবাদী তরঙ্গের সূচনা করেছিলেন তা মন্থর গতিতে হলেও পরবর্তী কালে সেই তরঙ্গের ধারা অব্যাহত রয়ে গিয়েছে।

[9] মৈত্র, শেফালী, ২০০৩, *নৈতিকতা ও নারীবাদ : দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা*, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ.১-২।

১.৬) আন্দোলন ব্যর্থতার কারনঃ-> নারীবাদী আন্দোলন যেহেতু কোন সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ আন্দোলন নয় তাই তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। যেমন – শিল্পবিপ্লবের (১৭৬০) সময় নারী-পুরুষ উভয়ই কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে। একই কাজ করার জন্য নারী-পুরুষের বেতনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে ইংল্যান্ডে কর্মের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য তা নিয়েই নারীবাদী আন্দোলন সরব হয়। আবার, ভারতের ক্ষেত্রে সমস্যাটা ছিল অন্যরকম। একদিকে ঔপনিবেশিকতার চাপ অপর দিকে লিঙ্গবৈষম্য – দুয়ের মাঝে নারীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। আবার, আমেরিকায় মূলত অধিকার আদায়কে কেন্দ্র করেই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ফলে বহুবিধ সমস্যার হেতু নারীবাদী আন্দোলন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আন্দোলন লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার নানা কারণ আছে তন্মধ্যে এটি একটি। অধ্যাপিকা শেফালী মৈত্রের ভাষায়,

নানান চাপে আন্দোলন কখনো স্থগিত থেকেছে, কখনও পিছু হটেছে, আবার কখনও পরিত্যক্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই মূল বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক সমস্যা জড়িয়ে গিয়ে সংগ্রামের লক্ষ্য ঝাপসা হতে থাকে।[10]

দ্বিতীয় কারণ হল, নারী নির্যাতনের চেহারা যে সময়ের সাথে সাথে বদলে যায় সেইদিকে মেয়েদের খেয়াল থাকে না। বিশেষ কোনো প্রকারের নির্যাতন বন্ধ হলে সেটাই পরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়। শেফালী মৈত্রের ভাষায়,

[10] তদেব,পৃ.৪।

সতীদাহের পরিবর্তে এখন কানে আসে বধূহত্যার সংবাদ। ইদানিং আবার বধূহত্যার তুলনায় গণ-ধর্ষণের ঘটনা আরও বেশি ঘটে।[11]

এই আন্দোলন ব্যর্থতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল লিঙ্গবৈষম্য। লিঙ্গ বৈষম্যের কোন স্পষ্ট রূপ নেই। এই লিঙ্গ বৈষম্যের চেহারা সময়ের সাথে সাথে বদল হয়েছে। পিতৃতন্ত্রের মূল যে সমাজের বহু গভীরে প্রোথিত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অন্যান্য সমস্যার থেকে এই সমস্যা অনেক বেশি অস্পষ্ট ও জটিল। ফলে অন্যান্য সমস্যার সাথে এই সমস্যাকে সমগোত্রীয় করে মনে করা ঠিক হবে না।

১.৭) লিঙ্গবৈষম্যের বৈশিষ্ট্যঃ-> অধ্যাপিকা শেফালী মৈত্রকে অনুসরণ করে লিঙ্গ বৈষম্যের কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হল :-

১) লিঙ্গ ভাবনা যে প্রকারে পরিব্যাপ্ত আর কোন বৈষম্য ভাবনাই সেভাবে আবিশ্বে ছড়িয়ে নেই। লিঙ্গ সমস্যা যে কেবল ভৌগলিক ভাবে পরিব্যাপ্ত তাই নয়, এটি আমাদের চিন্তার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম স্তরেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

২) লিঙ্গ সমস্যা অপরাপর সমস্যার সাথে যুক্ত হয়ে জটিল আকার ধারন করে। যেমন- তৃতীয় বিশ্বের একটি নিম্নবর্ণের মেয়ের সমস্যা শুধু লিঙ্গ-জনিত নয়। তার জীবনের সমস্যা ঔপনিবেশিকতা, বিত্ত, বর্ণ ও লিঙ্গের মিশ্রণে এক বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করে।[12]

---

[11] তদেব, পৃ.৪।

[12] তদেব, পৃ.৫-৬।

৩) লিঙ্গ সমস্যাটিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিসত্তাহীন (Impersonal) রূপে দেখা সম্ভব নয়। কেননা এই সমস্যাটি অন্যান্য সমস্যার মতো নয়। নারী পুরুষের সম্পর্কে যেমন বিদ্বেষের সম্পর্ক থাকে তেমনই থাকে ভালোবাসার সম্পর্কও (Love-hate relationship)। কিন্তু অন্যান্য বৈষম্যের ক্ষেত্রে ভালোবাসার কোন স্থান নেই। যেমন – প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক। সুতরাং লিঙ্গ বৈষম্য নামক সমস্যা অন্যান্য সমস্যা থেকে স্বতন্ত্র।

৪) লিঙ্গ বৈষম্যের চেহারাটি যেহেতু একরকম নয়, তাই এর প্রতিকারও প্রচলিত পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। এই সমস্যাটিকে চর্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে এর তাত্ত্বিক ভিত্তি গুলিকে ভালোভাবে বোঝা দরকার। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠান, ধর্ম ইত্যাদিও লিঙ্গবৈষম্যের বাহক হতে পারে। ফলে চর্যা, প্রতিষ্ঠান সর্বোপরি ধারণার পরিমণ্ডল – তিনটি ক্ষেত্রেই এই বৈষম্য ব্যাপ্ত। ফলত এই সমস্যা সমাধানে তত্ত্ব অপরিহার্য।

৫) তত্ত্বের কোন একটি বা দুটি শাখার সাহায্যে লিঙ্গ সমস্যা বোঝা যায় না। এই সমস্যাটি প্রকৃত অর্থে ইন্টারডিসিপ্লিনারি (Interdisciplinary) বা আন্তর্বিষয়ক সমস্যা। একই সঙ্গে ইতিহাস- ভূগোল- অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটিকে বুঝতে হবে।[13]

নানান উত্থান পতন সত্ত্বেও নারীবাদী আন্দোলন তখনও দর্শনের পর্যায়ভুক্ত হয় নি। তবে এই আন্দোলন নতুন ভাবে উজ্জীবিত হয় ১৯৭০ সাল থেকে।

[13] তদেব,পৃ.৬।

সত্তরের দশক থেকে উঠে আসা নারী আন্দোলনের নতুন জোয়ার 'নিউ ওয়েভ ফেমিনিজম' (New Wave Feminism) বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। তার আগে নারী আন্দোলন মূলতঃ দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৭০–এ তার সঙ্গে যুক্ত হল সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও জেহাদের সাথে যুক্ত হল কনসেপ্টস (Concepts) বা ধারণার স্তরে পরিবর্তনের দাবী। ফলত 'অ্যাকটিভিজিম' (Activism) বা সক্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে একটা নতুন বৌদ্ধিক মাত্রা পাওয়া গেল।[14]

১.৮) নারীবাদী আন্দোলন উত্থানের বিভিন্ন পর্যায়ঃ-> আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, পূর্বে নারীবাদ কেবল আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল - এই আন্দোলন ছিল মূলত অধিকার আদায়ের আন্দোলন। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে মেরী ওলস্টোনক্রাফ্টের (১৭৫৯-১৭৯৭) হাত ধরে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তিনি মেয়েদের সমান অধিকারের সমর্থনে *A Vindication of the Rights of Woman* (১৭৯২) শীর্ষক একটি বই লেখেন। তিনি মনে করতেন যে, নারী যদি সামান্য শিক্ষা না পায় তবে সে তার সমানাধিকার নিয়ে কোনো দিনই কোন কথা বলবে না। কিন্তু পরিস্থিতি ও চার্চের চাপে সেই বই নিষিদ্ধ হয়। এর প্রায় আশি বছর পর জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৪) *The Subjection of Women* (১৮৬৯) শীর্ষক একটি বই লেখেন। কিন্তু সেই বইও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়। পশ্চিমী সভ্যতা অষ্টাদশ শতক থেকে নারীর নানা অধিকার আদায়ের জন্য পুনরায় সরব হয়। তবে তারা সহজে সাফল্য পায় নি। অপরদিকে ভারতীয় নারীদের অবস্থাও সেই সময় একই রকম ছিল। ভারতীয় নারীরা প্রথম

[14] তদেব, পৃ.১।

ভোটাধিকার পায় ১৯২৯ সালে, তবে সেই অধিকার ছিল মুষ্টিমেয় নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং শর্তসাপেক্ষ। ভোট দানের জন্য নারীকে বিবাহিত, শিক্ষিত এবং সম্পত্তির আধিকারিনী হওয়া আবশ্যক ছিল। নারীবাদের এই ধারাকে প্রথম পর্যায়ের নারীবাদী আন্দোলন (First Wave Feminism) বলা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের নারীবাদের (Second Wave Feminism) সূত্রপাত ১৯৪০-এর দশকে মুলত যৌনস্বরূপ (sex) এবং লিঙ্গস্বরূপের (gender) মধ্যে পার্থক্যকে কেন্দ্র করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যৌনস্বরূপ বলতে, নারী ও পুরুষের মধ্যে যে দৈহিক পার্থক্য আছে তাকে ইঙ্গিত করা হয়। বলা যায় যে, এই পার্থক্য প্রাকৃতিক (natural)। অপরদিকে, লিঙ্গস্বরূপ সমাজ সৃজিত। নারী পুরুষের দৈহিক পার্থক্যকে কেন্দ্র করে যে, সামাজিক স্তরে নারী পুরুষের কাজের পার্থক্য করা হয়। এখানে শুধু পার্থক্য নেই বৈষম্যও বর্তমান। আগেই বলা হয়েছে যে, এই বৈষম্যের চেহারা বিভিন্ন রকমের। লিঙ্গস্বরূপের একটি মূল চরিত্র হল একটি কাজের নিরিখে অপর কাজকে বিচার করা এবং সেই কাজকে নীচু প্রতিপন্ন করা হয়। এটিও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের হয়। অর্থাৎ নারীবাদের উদ্ভব বৈষম্যকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নারীবাদের আপত্তি মুলত বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

১৯৭০–এর দশক থেকে নারীবাদী আন্দোলন পুনরজ্জীবিত হয়। এই সময় নারীবাদ কেবল আন্দলনে সীমাবদ্ধ ছিল না, আন্দোলনের পাশাপাশি তত্ত্ব বা কনসেপ্টকে প্রাধান্য দেয়। এই তত্ত্ব আলোচনায় যৌনস্বরূপ এবং লিঙ্গস্বরূপের পার্থক্য কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে। একে তৃতীয় পর্যায়ের নারীবাদ

(Third Wave Feminism) বলা হয়। এর অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন সিমন দ্য বোভায়ার রচিত গ্রন্থ *The Second Sex* (১৯৪৯)। এটি রচিত হয় ১৯৪৯ সালে, এরপর আধিকাংশ মহিলা অবদমন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। তারা প্রতিবাদের একটি ভাষা পায়। এই সময় থেকেই নারীবাদী নানা তত্ত্বের উদ্ভব হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'নারীবাদ' বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বকে বোঝানো হয় না, বরং নারীবাদের অনেক ভাগ আছে এবং প্রত্যেকেই ক্ষমতার অসমবন্টনের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাই নারীবাদীরা 'Feminism' বলার তুলনায় '**FEMINISMS**' বলাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তৃতীয় পর্যায়ে নারীবাদী আন্দোলনে আমরা নারীবাদী দর্শনগুলির পরিচয় পাই।

১.৯) নারীবাদের বিভাগঃ-> দর্শনের মূল স্রোতে যখন অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন, যুক্তিবাদী দর্শন এইরূপ ভাগ করা হয় তখন এই দার্শনিকদের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট হয় না। নারীবাদী দার্শনিকরা যেহেতু একটা ঘোষিত রাজনৈতিক অবস্থান থেকে দর্শন চর্চা করেন, তাই তাঁদের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী/অভিজ্ঞতাবাদী এইরূপ পার্থক্য না করে লিবারাল/ র‍্যাডিক্যাল বিভাজন করলে তাঁদের বক্তব্য বুঝতে সুবিধে হয়।[15]

দর্শনের অন্যান্য শাখার ন্যায় নারীবাদী দর্শনও বহুবিধ। তা সত্ত্বেও নারীবাদী দর্শনকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায় (ব্যাপক অর্থে)। যথা- উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism) ও চরমপন্থী নারীবাদ (Radical Feminism)। উদারনৈতিক নারীবাদ তথাকথিত তত্ত্বের পরিমার্জিত রূপ গ্রহণে আগ্রহী। অনেক

[15] তদেব,পৃ.১৭।

নারীবাদী দার্শনিক দর্শনের সাবেকী কাঠামোকে অবলম্বন করে নারীবাদী দর্শনকে সাজাতে আগ্রহী। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ অ্যারিস্টটল পন্থী নারীবাদের কথা বলা যায়। যেহেতু অ্যারিস্টটলের তত্ত্বটি বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয় এবং আবেগকে পরোপুরি অগ্রাহ্য করে সেহেতু কোনো নারীবাদীর অ্যারিস্টটলের মতটি গ্রহন করার কথা নয়। কারণ নারীবাদীরা আবেগকে, যাপিত অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়। তারা বুদ্ধি এবং আবেগের এই দ্বিকোটিক বিভাজন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মার্থা ন্যুসবম্-এর (জন্ম -১৯৪৭) তত্ত্বটি অ্যারিস্টটলের তত্ত্বের পরিমার্জিত রূপ। নারীদের সমস্যাকে উদ্দেশ্য করে ওনার তত্ত্বটি অ্যারিস্টটলের তত্ত্বের পরিমার্জিত রূপ। একই ভাবে ফ্রয়েড, কান্ট, হেগেল –এই প্রচলিত তত্ত্ব গুলিকে ব্যবহার করে উদারনৈতিক নারীবাদীরা তাদের তত্ত্ব গুলিকে গড়ে তোলেন। অপরদিকে, চরমপন্থী নারীবাদ তথাকথিত তত্ত্বকে পুরোপুরি খারিজ করে নতুন তত্ত্ব দিতে আগ্রহী। তারা মনে করন যে, তথাকথিত তত্ত্বে ইচ্ছাকৃতভাবে নারীর অন্তর্ভুক্তিকরণকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তারা মনে করেন, নারীর কোন যোগ্যতা নেই উক্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার। ফলে তারা তথাকথিত তত্ত্ব গুলিকে বাতিল করে নতুন তত্ত্ব কাঠামোয় (epistemology, metaphysics, logic, ethics etc.) দর্শনকে সাজাতে আগ্রহী। তাই বলা যায় যে, এই তত্ত্ব গুলিতে ক্ষমতার অসমবন্টন পরিহার করা হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, চরমপন্থী নারীবাদী যে তত্ত্ব প্রদানের কথা বলছেন তা কি কেবল মেয়েদের স্বার্থ চরিতার্থ করবে? অন্য ভাষায় সেই তত্ত্বের

পরিসর থেকে কি পুরুষ ব্রাত্য? উত্তরে বলা যায় যে নারীবাদী তত্ত্ব সর্বদায় বৈষম্য (Discrimination) বিরোধী, তন্ত্র (System) বিরোধী। তার অর্থ এটা নয় যে তারা নারী-পুরুষ বা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক যে পার্থক্য তার বিরোধিতা করবেন।

১.১০) দর্শনে অন্তর্ভুক্তি ও সিমন দ্য বোভায়ারঃ-> আমরা দেখলাম অধুনা নারীবাদী আন্দোলন তাত্ত্বিক ভিত্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিংশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে নারীবাদী আন্দোলনের নবজাগরণ শুরু হয় যার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন সিমন দ্য বোভায়ার (Simone de Beauvoir, 1908-1986) এবং তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ *The Second Sex* (১৯৪৯)। মেরী ওলস্টোনক্রাফটের মতো তাঁর বই নিষিদ্ধ হয় নি বা তাঁকে কুরুচিকর মন্তব্যের সন্মুখীন হতে হয় নি। কেননা ততদিনে সমাজিক জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হয়েছে। একই সঙ্গে নারীবাদী আন্দোলন একজন উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রদানকারীর সন্ধান পেয়েছিল। লেখকের ভাষায়,

তিনি বন্দিত হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর জননী রূপে, মেরীকে বলা হত নারীবাদের জোয়ান অব্ আর্ক এবং সিমন দ্য বোভায়ারকে বলা হত নারীবাদের আইনস্টাইন।[16]

১.১১) কেন সিমন দ্য বোভায়ারঃ-> ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে বহু স্বনামধন্য দার্শনিক থাকা সত্ত্বেও সিমন দ্য বোভায়ার কেন উক্ত গবেষণাপত্রে প্রাধান্য পাচ্ছেন? একাধারে লেখিকা, দার্শনিক - বিশেষতঃ নারীবাদী দার্শনিক, শিক্ষিকা, নাট্যকার সিমন হলেন বিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম একটি নাম

[16] সিংহ, ২০১৪, *দ্বিতীয় লিঙ্গ : সিমন দ্য বোভয়ার*, পৃ. ৯।

এবং আধুনিক নারীবাদী আন্দলনের **'Role Model'**। অধিকাংশ ব্যক্তিই তাকে *The Second Sex*-এর রচয়িতা বা জাঁ-পল-সার্ত্রের দোসর হিসাবেই জানেন। তবে তিনি যে নতুন দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেছেন – বিশেষতঃ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে *The Ethics of Ambiguity* (১৯৪৭)-এর মতো নীতিশাস্ত্র সংক্রান্ত বইয়ের প্রকাশ যা চিরাচরিত নৈতিকতার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি পিতৃতান্ত্রিক ভাবধারা থেকে বেড়িয়ে এসেছিলেন এবং তথাকথিত **'Ideal Woman'**-এর ধারণায় কুঠারাঘাত করেন এবং সেই ধারণাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চক্রান্ত বলেও প্রতিপন্ন করেন। তাঁর বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থ *The Second Sex*- এ দেখান যে, কিভাবে জীবনের প্রতিটি স্তরে মেয়েরা অবহেলিত, অবদমিত একই সঙ্গে 'অদৃশ্য'-ও (invisible)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি হয়ে ওঠেন অস্তিবাদী আন্দলনের অন্যতম প্রধান। বিশ শতকের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। তাঁর প্রজন্মে কোনও নারী অস্তিবাদী দর্শনের উপর এতটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেননি। তিনি বেড়িয়ে এসেছিলেন পিতৃতন্ত্রের আরোপিত ধর্ম থেকে।.... সবরকম বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন তিনি।..... তিনি দেখিয়েছেন লেখকদের কীভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হয় সময়ের কাছে। সময়ের দাবী পূরণ করাই হল লেখকের রচনার পূর্বশর্ত।[17]

একই সঙ্গে প্রেক্ষিত এবং পরিবেশ যে লেখায় প্রভাব ফেলে এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়া যে কোনোভাবে সম্ভব নয় তাও তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন।

[17] তদেব, পৃ.১০-১১।

দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল নীতিশাস্ত্র (Ethics) । আমার গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হল সিমন দ্য বোভায়ারের *The Ethics Of Ambiguity* (১৯৪৭) অনুসারে নৈতিকতার অবস্থান কি বা অনিশ্চিত নৈতিকতা বলতে কি বোঝায় তার উপর আলোকপাত করা। সিমনের নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনার সূচনা হয় অস্তিবাদী দর্শন এবং অস্তিবাদী নারীবাদ দর্শনের সাথে তাঁর পার্থক্যকে কেন্দ্র করে। অতএব সিমন দ্য বোভায়ারের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে অস্তিবাদী দর্শন এবং অস্তিবাদী দর্শনের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক কী বা তাদের মধ্যে আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি না তার আলোচনা আবশ্যক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অস্তিবাদী দার্শনিক বলতে বিশেষত সার্ত্রে এবং সিমনের দর্শনই আলোচ্য এবং তাঁদের দর্শনের পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অস্তিবাদীদর্শন : জাঁ-পল সার্ত্র ও সিমন দ্য বোভায়ার

২.১) অস্তিবাদী দর্শনের পটভূমিকাঃ-> দর্শন সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনার সূত্রপাত হয় প্রাচীন গ্রীসে – সক্রেটিসের হাত ধরে (অধিকাংশ মতানুসারে, সক্রেটিসের সময়কেই দর্শন আলোচনার সূত্রপাতের যথাযথ সময় বলে ধরা হয়)। তবে, সক্রেটিস যেহেতু কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সক্রেটিস কথোপকথন পদ্ধতির (Dialogue Method) মাধ্যমেই দার্শনিক আলোচনা করতেন] তাই সেই আলোচনা পূর্ণতা পায় কালজয়ী দার্শনিক প্লেটোর (৪২৮/২৭খ্রিষ্টপূর্বাব্দ–৩৪৮/৪৭খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। একথা মনে করা ভুল হবে যে, সক্রেটিস ও প্লেটোর দর্শনচিন্তায় কেবল সাদৃশ্যেই আছে। এই দুই দার্শনিকের চিন্তার মধ্যে বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে তাদের উত্তরসূরি এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অ্যারিষ্টটলও নিজস্ব চিন্তা ভাবণার দ্বারা দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছেন। দর্শনের শুরুর সময় দর্শনের আলোচনার কেন্দ্রস্থল অধিকার করেছিল ‘সত্তাতাত্ত্বিক বিষয়’ (Ontological), অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি, জগতের অন্তর্গত বিষয় বা বস্তুগুলির অবস্থান ইত্যাদি বিষয়। দর্শন চর্চার ইতিহাস বোঝার চেষ্টা করলে ওই সময়ের দর্শনকে বলা যেতে পারে ‘Ontological Turn’।

মধ্যযুগীয় দর্শন তেমন সমৃদ্ধ নয়। মধ্যযুগে দর্শন চর্চার তুলনায় ধর্ম-বিশ্বাসকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হত। ধর্ম বিশ্বাসকে আশ্রয় করে থাকে অপরদিকে দর্শন যুক্তিকে। ফলতঃ প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিষ্টটলের হাত ধরে দর্শনের যে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল মধ্যযুগে এসে তা অস্তমিত হয়। তবে কিছু কিছু ধর্ম যাজক ও পুরোহিত স্বতন্ত্রভাবে দর্শনের আলোচনা করলেও দর্শনকে 'ধর্মীয় বিশ্বাসের' উর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারা যায় নি। এই জন্যই অনেকে মধ্যযুগকে দর্শন আলোচনার 'অন্ধকার যুগ' (Dark Age) বলে আখ্যায়িত করেন।

রেনেসাঁ (Renaissance) ও রিফরমেশন (Reformation) এর যুগ থেকে দর্শনের রুদ্ধগতি পুনরায় গতি সম্পন্ন হয় এবং দর্শনের আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। 'আধুনিক যুগের সূত্রপাতের' সঠিক সময় নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। তবুও মনে করা হয় যে, ইংল্যান্ডে ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৯৬-১৬২৬) হাত ধরে এবং ফ্রান্সে রেঁনে দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) দর্শন চিন্তার দ্বারা দর্শনে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। আধুনিক যুগে অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসকে নাকচ করে যুক্তি দ্বারা সবকিছুকে বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা যায়। ফলত, মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বিশ্বাস অনেকাংশে পিছনে ফেলে যুক্তিগ্রাহ্যতা বেশী প্রাধান্য পায়। প্রাচীন যুগে যেমন সত্তাতাত্ত্বিক বিষয় ছিল মূল আলোচ্য, আধুনিক যুগে সেই স্থান অধিকার করে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা।

'জ্ঞানলাভের উপায় কী' – এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আধুনিক দার্শনিকগণ দ্বিধা বিভক্ত। একদল দাবী করেন যে, যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় হল বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা (Reason)। এই অভিমত প্রদানকারীদের বুদ্ধিবাদী (Rationalist) বলা হয়। অপর অভিমতানুসারে, অভিজ্ঞতাই (Experience) হল একমাত্র পন্থা যথার্থ জ্ঞান আহোরণের। এই অভিমত প্রদানকারীদের অভিজ্ঞতাবাদী (Empiricism) বলা হয়।

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ – এই সুদীর্ঘ কালব্যাপী পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করলে বোঝা যায় যে, তারা জগতের একটি মুলতত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং মনে করেন যে ঐ মূলতত্ত্ব জনিত রহস্যের উদঘাটন করাই দর্শনের কাজ। জগত এবং মনুষ্য জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জগতের যেমন মূলতত্ত্বের কথা তারা বলেন, তেমনই মানব জীবনেরও একটি সারতত্ত্ব (Essence) আছে বলে তারা মনে করেন। মানুষের লক্ষ্য হল সেই 'সারতত্ত্ব'-কে অনুসন্ধান করা। অর্থাৎ জগৎ বা মানবজীবনের পূর্ব নির্ধারিত একটি আদর্শ (Ideal) আছে এবং যাকে অনুসন্ধান করাই দর্শন তথা মানবজীবনের উদ্দেশ্য। প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিকযুগ – এই সুদীর্ঘ কালব্যাপী দর্শন যে ভাবধারায় নিজের শাখা-প্রশাখা ব্যাপৃত করেছে তাকে দর্শনের ভাষায় 'সারসত্তাবাদ' (Essentialism) বলা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সারসত্তা বাদের বিপরীত ভাবধারা রূপে অস্তিবাদী (Existentialism) দর্শনের উৎপত্তি। কিন্তু যে প্রশ্নটি ওঠে,

সারসত্তাবাদ ও অস্তিবাদের মধ্যে পার্থক্যটা কী? অন্য ভাষায়, সারসত্তাবাদের সীমাবদ্ধতা কী?

শিল্পবিপ্লব (১৭৫০-১৮৫০) মানব সভ্যতার ইতিহাসে কিছু পরিবর্তন আনে। শিল্পবিপ্লবের ফলে বিভিন্ন ধরণের কাজের প্রতুলতা অর্থাৎ 'পুঁজিবাদী' (Capitalism) ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার ফলে মানুষ নিজের শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই সময় মানবিকতাকে তুচ্ছ করে মানুষকে 'পণ্য'-তে পরিনত করাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। অন্যভাবে বলা যায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিজেকে কায়েম করার জন্য মানুষকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে। এর ৬৪ বছর পর অর্থাৎ ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলাও সমাজ জীবনে পুনঃরায় বিপর্যয় ডেকে আনে। সাধারণ মানুষ, জীবন সম্পর্কে নানা ভাবে ভাবতে শুরু করে। এই বিশ্ব যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মানুষ তার অস্তিত্ব সংকটের সন্মুখীন হয়। সমসাময়িক দার্শনিক বা সাহিত্যিকরা এই অবর্ণনীয় কষ্ট এবং বীভৎসতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ডেনমার্কের দার্শনিক কিয়েরকেগার্দের (Kierkegaard, ১৮১৩-১৮৫৫) লেখায় তারা সেই বীভৎসতাকে ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পেলেন। সৃষ্টি হল দর্শনের অপর এক শাখার যার নাম 'অস্তিবাদ' (Existentialism)। কিয়েরকেগার্দকে (Kierkegaard) 'অস্তিবাদী দর্শনের জনক' বলা হয়। তবে এই দর্শন জনপ্রিয়তা লাভ করে বিংশ শতাব্দীর স্বনামধন্য দার্শনিক জাঁ-পল-সার্ত্রের (১৯০৫-১৯৮০) দার্শনিক ভাবনার দ্বারা। কিয়েরকেগার্দের চিন্তার পূর্বে দর্শনে যে

অস্তিবাদের নামমাত্র ছিল না এমন কথা বলা যায় না। তবে 'Existentialism' শব্দটি কিয়েরকেগার্দের (Kierkegaard) ব্যবহার করেন নি, ১৯৪০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে গ্যাবিয়েল মার্সেলের (১৮৮৯-১৯৭৫) লেখায় এই শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

সারসত্তাবাদের বিপরীত ভাবধারা রূপে অস্তিবাদ – দার্শনিক মহলে নানা ভাবে সমালোচিত হয়, অনেকে একে দর্শন বলার তুলনায় কেবল আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী। কেননা অস্তিবাদী দর্শন পূর্বনির্ধারিত বা সুপরিকল্পিত কোনো ক্রম অনুসরণ করে না। এককথায় সারসত্তাবাদ ও অস্তিবাদের পার্থক্য ব্যক্ত করতে গেলে বলা যায়, সারসত্তাবাদ অনুসারে, 'Essence precedes existence or Essence determines existence' অর্থাৎ 'সারসত্তা অস্তিত্বের পূর্বনির্ধারক' এবং অপরদিকে অস্তিবাদ অনুসারে 'Existence precedes essence or Existence determines essence' অর্থাৎ 'অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্ববর্তী'। বলা বাহুল্য যে, "Existence precedes essence" এটি অস্তিবাদী দার্শনিক জাঁ-পল-সার্ত্রের বিখ্যাত উক্তি।

২.২) অস্তিবাদের স্বরূপঃ-> দর্শনের কোনো শাখারই সুসংহত বা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। অস্তিবাদী দর্শনের শুরুতেই 'অস্তিবাদ' বলতে কী বোঝায় এই প্রশ্নটি মনে আসে। দার্শনিক Ursula Tidd-এর ভাষায়,

What is existentialism? The term is sometimes used narrowly in the connection with the work of Jean-Paul-Sartre; however, its refer more

generally to the work of several nineteenth and twentieth century philosophers, such as Soren Kierkegaard (1813-1855), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Karl Jaspers(1883-1969), Martin Heidegger (1889-1976), Grabiel Marcel (1889-1973), Jean-Paul-Sartre (1905-1980), Maurice Marleau Ponty (1905-1961), and Simone de Beauvoir (1908-1986).[1]

আবার Marjorie Grene–এর ভাষায়,

Existentialism is the philosophy which declares as its first principle that existence is prior to essence. This is presumably, a technically accurate principle, yet as simple and intelligible as '2 and 2 are 4'.[2]

পুনরায়, John Macquarrie–এর ভাষায়,

When we try to say that existentialism is, we are confronted with a certain elusiveness.....In the existentialist view there are always loose ends. Our experience and knowledge are always incomplete and fragmentary.[3]

অস্তিবাদী দর্শনকে সংজ্ঞায়িত করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য কাজ এবং যদি অস্তিবাদী দর্শনের মূলকথা অর্থাৎ 'পূর্বস্বীকৃতিকে অস্বীকার করা হয়', তবে অস্তিবাদকে সংজ্ঞায়িত করার অর্থ অস্তিবাদের বিরুদ্ধাচরন করার মতো। কেননা

[1] Tidd, Ursula .2004. *Simone De Beauvoir*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group. P.14.

[2] Grene, Marjorie. 1948. *Introduction to Existentialism*. Chicago: Phoenix books The University of Chicago Press. P.2.

[3] Macquarrie, John. 1972. *Existentialism*. New York: Penguin Books. P.13.

অস্তিবাদ সর্বদাই একটি খোলামুখের কথা বলে। আর অস্তিবাদকে সংজ্ঞায়িত করার অর্থই হল অস্তিবাদকে বেঁধে ফেলার মতো। এতদসত্ত্বেও, মোটাদাগে অস্তিবাদ বলতে সেই দর্শনকে বোঝানো হয়, যে দর্শন পূর্ব-নির্ধারিত তত্ত্বের বিপক্ষে মানব অস্তিত্বকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়।

অস্তিবাদী দার্শনিকদের মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। একদল হল আস্তিক অস্তিবাদী – অস্তিবাদের জনক সোরেন কিয়েরকেগার্দ (Kierkegaard), ইয়েসপার্স ও গ্যাবিয়েল মার্সেল – এই মতের সমর্থক। এবং অপর দল হল নাস্তিক অস্তিবাদী। ফ্রেডরিক নীৎশে, মার্টিন হাইডেগার, জাঁ-পল-সার্ত্রে এবং সিমন-দ্য-বোভায়ার এই মতের সমর্থক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত স্থলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকারীদের আস্তিক এবং অবিশ্বাসকারীদের নাস্তিক বলা হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত সত্তাকে অস্বীকার করে কী ভাবে ঈশ্বর আস্তিত্ব অস্তিবাদীদের কাছে স্বীকৃত তা এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য নয়।

উক্ত গবেষণা পত্রে অস্তিবাদী দার্শনিক জাঁ-পল-সার্ত্রে এবং সিমন দ্য বোভায়ারের অস্তিবাদ (নারীবাদী অস্তিবাদী) আলোচ্য।

অস্তিবাদের জনক কিয়েরকেগার্দের (Kierkegaard) প্রভাব সার্ত্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তবে তাঁরা সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ পান নি এবং সার্ত্রের প্রভাব সিমনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তারা ছিলেন একে অপরের দোসর। একথা উল্লেখ্য যে, দার্শনিক হিসাবে প্রত্যেক অস্তিবাদী দার্শনিকের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি ভাবে তারা প্রত্যেকেই যে বিষয়ে

সহমত পোষণ করেন যে, 'মানব অস্তিত্ব সর্বাগ্রে'। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, 'অস্তিত্ব' (Existence) বলতে অস্তিবাদী দার্শনিকরা কী বোঝেন? অধ্যাপক মৃনালকান্তি ভদ্র মহাশয়কে অনুসরণ করে বলা যায়,

.....যে অস্তিত্বের কথা অস্তিবাদীরা বলেন এবং যে অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় তারা আগ্রহী, তা মানব অস্তিত্ব, বিশেষ করে, ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব। ব্যক্তি দুভাবে জীবনযাপন করে, এক, গোষ্ঠীর নিয়ম অনুযায়ী সে জীবনযাপন করে অর্থাৎ প্রতিদিনকার জীবন যাপনে সে যে কাজগুলি করে, সেগুলি অন্যেরাও করে থাকে। এগুলি প্রাত্যহিক নিত্য কাজের অন্তর্গত এবং এগুলি করার মধ্যে সে কোনও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুভব করেনা। তাই দ্বিতীয় যে ধরনের কাজের কথা কিয়েরকেগার্দ বলেন, সে কাজ একেবারে ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্বের সাথে জড়িত। এ কাজ তার স্বকীয় অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে। সাধারণত দ্বিতীয় ধরণের কাজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যখন ব্যক্তি কোন সংকটের পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়, যখন তাকে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যে অস্তিত্বে অন্য সব মানুষের মতো গোষ্ঠী নিয়ম পালন করতে হয়, অস্তিবাদীরা বলবেন, সে অস্তিত্ব শুধু বেঁচে থাকা, অস্তিত্ব নয়, কারণ অস্তিত্বে মানুষ তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে। সে উপলব্ধি করে সে একজন ব্যক্তি।[4]

পূর্বেই উল্লিখিত যে, প্রত্যেক অস্তিবাদী দার্শনিকের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে, তথাপি 'অস্তিত্ব' বলতে কী বোঝায় সেই প্রসঙ্গে অধিকাংশ অস্তিবাদী দার্শনিক সহমত পোষণ করেন। তাই অস্তিত্বের অর্থ কী এই প্রসঙ্গে পুনরায় মৃনালকান্তি ভদ্র মহাশয়কে অনুসরণ করে বলা যায়,

.....অস্তিত্ব বলতে বোঝায় ১) ব্যক্তির অস্তিত্ব এমন যুক্তি যার দ্যোতক নয়, কারণ যুক্তি অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বিভিন্ন মানুষের সাদৃশ্য তুলে ধরে। ২) অস্তিত্ব আবেগের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে।

[4] ভদ্র, মৃনালকান্তি, ১৯৯১, *জাঁ-পল সার্ত্রের অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ*, বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.১০।

৩) অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত নেওয়া, কর্মপন্থা বাছাই এবং তার সাথে জড়িত উদ্বেগ, অনিশ্চয়তার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। ৪) .....অস্তিত্বের সঙ্গে স্বাধীনতা গভীর ভাবে যুক্ত।[5]

সমগোত্রীয়কথাদার্শনিক Ursula Tidd–এর লেখাতেও পরিলক্ষিত হয়।

তাঁর ভাষায়, **.....If existentialism could be summarised in three words, they might be 'freedom', 'responsibility', and 'authenticity'. Existentialist claims that human beings have no predetermined purpose or essence laid down by God or nature. They are responsible for creating their lives according to their own values--- ....by reflecting clearly of their situation and relationship by acting authentically.**[6]

সুতরাং এ কথা স্পষ্টতই উপলব্ধ হয় যে, অস্তিবাদী দার্শনিকগণ ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতের একটি খোলামুখের কথাও বলেছেন।

২.৩) সার্ত্রের অস্তিবাদঃ-> দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে অস্তিবাদী দর্শনের প্রতি মানুষের ঝোঁক দেখা যায়। যে কোন রকম যুদ্ধ মানবজাতির অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই সময় ব্যক্তির 'freedom' (স্বাধীনতা), 'resposibility' (দায়বদ্ধতা), 'authenticity' (সততা) প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সার্ত্র রচিত *Being and Nothingness* (১৯৪৩) অস্তিবাদের পক্ষে একটি শক্ত খুঁটি স্থাপন করে। কিন্তু অনেকেই (বিশেষতঃ

[5] তদেব, পৃ.১১।

[6] Tidd. 2004. *Simone De Beauvoir.* P.14.

সারসত্তাবাদীরা) মনে করেন যে, *Being and Nothingness* মানবিকতা সম্পর্কে একটি অনিশ্চয়তার সন্ধান দেয়। তাই *Being and Nothingness* অমানবিকতার শিক্ষা দেয়। যদিও *Being and Nothingness* সম্পর্কে এটি একটি ভুল ব্যখ্যা তথাপি এই গ্রন্থ সম্পর্কে এমন কথা পাওয়া হয়।

যে সম্প্রদায়রা সার্ত্রের *Being and Nothingness*-এর বিপক্ষে সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হল কমিউনিস্ট সম্প্রদায়। তাদের আপত্তি হল – অস্তিবাদী দর্শন মানুষকে হতাশায় নিমজ্জিত হওয়ার আহ্বান জানায়। কেননা অস্তিবাদী দর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তি তার প্রেক্ষিতানুসারে কার্যসিদ্ধি করে। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিভিন্ন প্রেক্ষিতানুসারে একটি কাজ একই সঙ্গে নৈতিক ও অনৈতিক, ঠিক ও ভুল হতে পারে। ফলে শেষ পর্যন্ত 'অস্তিবাদী দর্শন' কেবল চিন্তাতেই পর্যবসিত হবে। মার্কসের মতে, চিন্তা যেহেতু বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয় তাই অস্তিবাদী দর্শন বুর্জোয়া দর্শনের রূপ নেবে।

সার্ত্রের বিপক্ষে অপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় ক্যাথলিক চার্চের পক্ষ থেকে। যেহেতু অস্তিবাদী দর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং পূর্বনির্ধারিত সারসত্তা বিরোধী তাই পূর্বনির্ধারিত ঈশ্বরের শাশ্বত বাণী এবং তথাকথিত মানবিক মূল্যবোধকে অস্তিবাদ অগ্রাহ্য করে। তাই চার্চের পক্ষ থেকে আপত্তি ওঠে যে, অস্তিবাদী দর্শন সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে ব্যক্তির মানবিক মূল্যবোধ এবং আদর্শাবলীকে ত্যাগ করে ব্যক্তিকে নিঃসঙ্গ জীবনের উপদেশ দেয়।

অপর একটি আপত্তি ওঠে বিশ্লেষণাত্মক দার্শনিকগনের (Analytic Philosopher) থেকে। যেহেতু অস্তিবাদী দর্শনে কোনো পূর্বনির্ধারিত তত্ত্ব স্বীকার করা হয় না, অথবা কোনো অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি বা দায়বদ্ধতা (commitment) নেই, সেই হেতু তারা অস্তিবাদকে দর্শন বলার তুলনায় 'আন্দোলন' বলতেই বেশী পছন্দ করেন। কেননা 'দর্শন' বলতে গেলে কিছু একটা বিষয়কে নিশ্চিত রূপে স্বীকার করা আবশ্যক। তাদের মতে, যদি তা না করা হয় তবে তাকে দর্শন বলা যায় না। কেননা অনিশ্চয়তা ব্যাখ্যা করতে গেলে নিশ্চিত রূপে কিছু একটা স্বীকার করতে হবে, অন্যথায় অনিশ্চয়তাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না বলেই তারা মনে করেন। সুতরাং বিশ্লেষণাত্মক দার্শনিক সমূহের কাছে অস্তিবাদী দর্শন কোন দর্শন নয় বরং আন্দোলনের সমতুল্য।

উপরিউক্ত আপত্তি সমূহের উত্তরদানের চেষ্টা স্বরূপ সার্ত্র *Existentialism Is a Humanism* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং ১৯৪৫ সালে club Maintenent-এ এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯৪৬ সালে সেই বক্তৃতাটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়।

উপরিউক্ত সমালোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে বলা হয় যে, এই সমস্ত আপত্তির মূলে হল 'অস্তিবাদ' শব্দটি, সর্বোপরি 'অস্তিত্ব' শব্দটির বিকৃত অর্থ অনুধাবন করা।

সার্ত্রে যখন অস্তিত্বের কথা বলেন, তখন তিনি বোঝাতে চান, স্বাধীনতার উপলব্ধির মধ্যেই মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে এবং মানুষ অনুভব করে তার জীবনে উদ্দেশ্য আছে, সম্ভবনা আছে।

সে জানে অচল, অনড় বস্তু থেকে সে পৃথক এবং তার অস্তিত্বকে যুক্তি ও ধারণা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যক্তি আরও উপলব্ধি করে, সে যে কাজ করে তারও কোনও যুক্তি নেই, কেন সে একটা কাজ ঠিক না করে আর একটা করে। ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতনতা, চারপাশের বাঁধা সৃষ্টি করা জগত সম্বন্ধে বিরক্তি, নিজের যুক্তিহীন জীবনের প্রতি ক্ষোভ, পৃথিবীতে পরিত্যক্ত অবস্থার জন্য রিক্ততা বোধ, স্বাধীন সিদ্ধান্তের সফলতার অনিশ্চয়তার অনুভূতি -- সব কিছু মিলিয়ে সার্ত্রের মতে ব্যক্তির অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে।[7]

অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে যে উদ্বেগের উপস্থিত হয় তাইই হল সার্ত্রের ভাষায় 'অনিশ্চয়তা'। অতএব সার্ত্রের বিপক্ষে অনিশ্চয়তা সম্পর্কে কোন আপত্তি ওঠা সঙ্গত নয়। পুনঃরায় 'অস্তিবাদ' বলতে তিনি বোঝান যে, 'অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্ববর্তী' (Existence precedes essence)। প্রশ্ন হল এর অর্থ কী ? সার্ত্রের ভাষায়,

what do we mean by saying existence precedes essence? We mean that man first of all exists, encounters himself, surges up the world – and define himself afterwards.[8]

সার্ত্রের মতে, ব্যক্তি শূন্যসত্তা থেকে নিজের যাত্রা শুরু করে ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করে অর্থাৎ তার জীবনে একটি অনিত্যতা (Contingency) আছে। কারণ জন্মাবস্থায় আমরা কেবল নিছক একজন আমি

---

[7] ভদ্র, ১৯৯১, *জাঁ-পল সার্ত্রের অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ*, পৃ. ১১-১২।

[8] Sartre, Jean Paul. 1946. Translated by Philip Mairet. *Existentialism Is a Humanism.* United States: 'Fair Use' provisions. P.3.

তদাতিরিক্ত কিছু নই, সেই সময় কেবল 'আমি আছি' এই বোধই হয়। পরবর্তীকালে স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে ক্রমশ গঠন করে। অর্থাৎ সে 'বিয়িং-ইন-ইটসেল্ফ' (Being-in-itself) হবে, নাকি 'বিয়িং-ফর-আদার্স' (Being-for-others) হবে, নাকি 'বিয়িং-ফর-ওয়ানসেল্ফ' (Being-for-oneself) হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'বিয়িং-ইন-ইটসেল্ফ' বলতে বোঝায় ব্যক্তি যখন কোনো প্রকল্প গ্রহণ না করে স্থাণুবৎ জীবনযাপনে উদ্যোগী হয় অর্থাৎ সে তার স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করে। 'বিয়িং-ফর-আদার্স' বলতে বোঝায়, যখন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ভাবধারায় নিজেকে সমর্পণ করে জীবন ধারন করেন অর্থাৎ নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রকল্পের প্রতি দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করেন। 'বিয়িং-ফর-ওয়ানসেল্ফ' বলতে বোঝায় ব্যক্তি যখন নিজের স্বাধীনতাকে অনুসরণ করে নিজস্ব প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে সুস্থ এবং উদ্বেগপূর্ণ জীবন যাপন করে, অর্থাৎ ব্যক্তি যখন নিজের স্বাধীনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সুতরাং, পূর্বনির্ধারিত মানব সত্তা (Human Nature) বলে কিছু হয় না। ফলে সার্ত্রের মতে ঈশ্বরের ধারনাও (Concept of God) কেবল কল্পনা মাত্র। তাঁর মতে, অস্তিবাদকে ভুল বোঝার আগে অস্তিবাদের মূল নীতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। সার্ত্রের ভাষায়,

Thus, there is no human nature, because there is no God to have a conception of it. Man simply is. Not that he is simply what he wills, and as he conceives himself after already existing --- as he wills to be after

that leap towards existence. Man is nothing else but that which he makes of himself. That is the first principle of existentialism.[9]

স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটি ওঠে, অস্তিবাদী দর্শনানুসারে পূর্বনির্ধারিত সত্তা বলে কিছু হয় না, ব্যক্তিই প্রধান চরিত্র, ব্যক্তির কোনো সত্তা (Essence) বা আদর্শ (Ideal) নেই, ব্যক্তি স্বাধীন, যে স্বাধীনতাকে সে জাহির করে নিজস্ব প্রকল্প গঠনের মাধ্যমে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, এক অর্থে এই দর্শন কি আত্মকেন্দ্রিক দর্শন নয়? বা এই দর্শনানুসারে, ব্যক্তির সাথে অপর (Other) ব্যক্তির সম্পর্ক কী? বা অপর ব্যক্তি কি আদৌ ব্যক্তির প্রকল্পের অধীন? অপর ব্যক্তির স্বাধীনতা কী স্বীকৃত? যদি অপর ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় তবে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং অপর ব্যক্তির স্বাধীনতা কী একে অপরের পরিপন্থী? সার্ত্রের অস্তিবাদী দর্শন প্রসঙ্গে উপরিউক্ত প্রশ্ন গুলি আবশ্যক। উপরিউক্ত প্রশ্ন সমূহের উত্তর প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল,

.....when we say that man is responsible for himself, we do not mean that he is responsible only for his own individuality, but he is responsible for all men.....[10]

অর্থাৎ ব্যক্তি যখন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করবে তখন ব্যক্তি কেবল নিজের জন্য বা নিজের স্বার্থেই প্রকল্প গঠন করবে এমন নয়, সে অন্য ব্যক্তি তথা সমাজের স্বার্থে প্রকল্প গঠন করবে। যা সমাজের অধিক স্বার্থ পূরণ করবে তাইই প্রকল্প

[9] Ibid, P.3.

[10] Ibid, P.4.

হিসাবে গৃহীত হবে। অর্থাৎ প্রকল্প গঠন কালে সে একজন কর্তা (Creator)। তাই অন্যান্য ব্যক্তি বা অপরকে (Other) অগ্রাহ্য করে প্রকল্প গঠন সম্ভব নয়। রুশোর মতো সার্ত্রেও মনে করেন যে, **'Men are born free'** অর্থাৎ ব্যক্তি জন্ম থেকেই স্বাধীন। তবে সেই স্বাধীন চেতনার বোধ থাকা বা না থাকা সেটা পরিস্থিতি (Facticity) নির্ভর। সার্ত্রের জীবনের শেষ দিকের লেখায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই যে ভাবে ব্যক্তি A-এর প্রকল্পে ব্যক্তি B-এর অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে, একই রকম ভাবে ব্যক্তি B-এর প্রকল্পে ব্যক্তি A-এর অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে। কারণ তিনি মনে করতেন যে, মুক্তি কখনোই একা একা ঘটতে পারে না, তার জন্য 'অপর'-এর সাহায্য প্রয়োজন। ফলত সার্ত্রের অস্তিবাদ 'আত্মকেন্দ্রিকতা' দোষে দুষ্ট এমনও বলা যায় না।

সার্ত্রের বিপক্ষে 'কমিটমেন্ট' বা দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত একটি আপত্তি ওঠে। যেহেতু সার্ত্র তথা অস্তিবাদী দার্শনিকরা মনে করেন যে, পূর্ব নির্ধারিত কোনো সত্তা নেই এবং আমাদের জীবনে একটা অনিশ্চয়তা সব সময় আমাদের গ্রাস করে এবং এই অনিশ্চয়তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য 'নিশ্চয়' বলে কোনো কিছুকে স্বীকার করা হয় না। ফলত কোনো কিছুর জন্যই কোনো অঙ্গীকার বা দায়বদ্ধতা নেই --- এই জাতীয় একটি আপত্তি ওঠে। এর উত্তর প্রসঙ্গে বলা হয়,

সার্ত্র-র মতে 'কমিটমেন্ট'-এর একটা 'সাবজেকটিভ' বা বিষয়ীগত দিক আছে। 'ব্যাড ফেথ' এড়াতে গেলে ব্যক্তির নিজস্ব প্রকল্প থাকতে হবে। সেই প্রকল্প নির্বাচনের জন্য কতগুলি

মৌলিক নির্বাচন করতে হয়। কমিটমেন্ট'-এর বিষয়ীগত দিক হল এই নির্বাচনের দায় স্বীকার করা। কমিটমেন্ট'-এর একটা 'অবজেকটিভ' বা বিষয়গত দিকও আছে। সেটা হল প্রতিটি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্রিয়াটির রূপকারের সঙ্গে জগতের সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেওয়া। 'কমিটেড লিটেরেচার' লেখার জন্য শ্রেনিহীন সমাজ থাকাটা একটা আবশ্যিক শর্ত, কিন্তু এটা পর্যাপ্ত শর্ত নয়। মানুষকে আত্মসচেতন হতে হবে। আবার শুধুমাত্র আত্মসচেতন হলেও হবে না, সততার সাথে বাস্তব পরিস্থিতিকে বুঝে নিতে হবে।[11]

সার্ত্র তথা অস্তিবাদী দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য হল স্বাধীনতা। প্রশ্ন হল 'স্বাধীনতা' বলতে কী বোঝায়? স্বাধীনতার অর্থ কী যা খুশি তাই করা? বা স্বাধীনতার অর্থ কী সীমাহীনতা নাকি স্বাধীনতার কোনো সীমা আছে? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সার্ত্রের দর্শনে ব্যক্তি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করে তাই এই প্রশ্ন গুলি আশা আবশ্যক। স্বাধীনতার অর্থ নিজের বিবেচনা অনুসারে প্রকল্প গঠন করা এবং তাকে বাস্তবায়িত করা। এর ফলেই ব্যক্তির অনিত্যতা থেকে মুক্তি ঘটে।

..... সার্ত্র্ মনে করতেন যে এই অনিত্যতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ আছে। সেই পথ হল শব্দাশ্রিত। সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ 'কনটিনজেন্সি'-কে অতিক্রম করে অমর হতে পারে। এই সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই তার মুক্তি। সাহিত্য হল কল্পনার আধার এবং কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে মানুষ অর্থ রচনা করতে পারে, এইখানেই তার মুক্তি। ছেলেবেলায় দাদামশায়ের গ্রন্থাগারে বসে সার্ত্র্ বই পড়ে জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন। বিশ্বের পরিচয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের পথ ধরে তাঁর কাছে আসেনি, এসেছিল শব্দের পথ ধরে, ভাষার মাধ্যমে, বাক্যের মাধ্যমে। তিনি

[11] মৈত্র, শেফালী, ২০১৩, *উজানি মেয়ে: সিমন দ্য বোভায়ার-এর জীবন ও দর্শন*, কলকাতা : এবং মুশেয়ারা, পৃ.৪১।

মনে করেছিলেন জগৎকে শব্দ-বন্ধনে ধরে ফেলতে পারলে জগৎকে খানিকটা সুস্থিতি দেওয়া যাবে, একটা অর্থ দেওয়া যাবে।[12]

অর্থাৎ প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিপক্ষে গিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গঠনের মাধ্যমে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করা। সার্ত্রের মতে, যদি তা করতে ব্যক্তি অস্বীকার করে, অপরের পছন্দ মতো জীবনযাপন করে তবে সে মন্দ বিশ্বাস বা 'ব্যাড ফেথের' (Bad Faith) বশবর্তী। অপরের মতো করে বাঁচা আদতে স্বাধীনতা নয়, বরং কৃত্রিম স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার ভান। অর্থাৎ এতে সততা বা অথেনটিসিটিকে অস্বীকার করা হয়। সুতরাং প্রকল্পবিহীন জীবন যাপন তাঁর মতে, মৃত্যুর সমার্থক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বাধীন নির্বাচিত প্রকল্প গঠন এবং সেই অনুসারে জীবন যাপন করা হল 'বিয়িং-ফর-ওয়ানসেল্ফ' এর মতো জীবন। তিনি আরও বলেন,

মৃত্যুর অর্থ হল 'বিয়িং-ফর-ওয়ানসেল্ফ'-এর সমাপ্তি এবং 'বিয়িং-ফর-আদার্সে'-এর শুরু।[13]

কেননা মৃত্যুর পর অপর ব্যক্তি কিভাবে ব্যক্তিকে মনে রাখবে বা রাখবে না সেটা অপরের বিষয়। সেখানে ব্যক্তি কিভাবে জীবনকে দেখেছে সেটা গুরুত্ব পাবে না, গুরুত্ব পাবে ব্যক্তিকে অপরে কিভাবে দেখছে। যেমন- সিমন দ্য বোভায়ার মনে করতেন যে, তিনি সার্ত্রের দেখানো পথ অনুসরণ এবং অনুকরণ করছেন মাত্র অর্থাৎ এই মনে হওয়াটা জীবনের প্রতি সিমনের দেওয়া নিজস্ব অর্থ। তাই এটা হল 'বিয়িং-ফর-ওয়ানসেল্ফ' এবং সিমনের অনুগামী দার্শনিকরা মনে করেন যে, সিমন কেবল সার্ত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি বরং নিজে একটি নতুন দর্শনের

[12] তদেব, পৃ.২৬।

[13] তদেব, পৃ.৫০।

সৃষ্টি করেছেন এবং সার্ত্রের শেষের দিকের লেখনশৈলী এবং অভিমত প্রদান বহুলাংশে সিমনের দার্শনিক ভাবনার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সিমনকে সিমনের চোখ দিয়ে না দেখে অপর ব্যক্তি নিজের মতো করে বুঝছেন। অর্থাৎ অপর ব্যক্তিই সিমনের লেখার অর্থ দিচ্ছেন। এই বিষয়টি হল 'বিয়িং-ফর-অদার্স'।

তবে সার্ত্রের মত সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। সার্ত্রের জীবনের শেষ দিকের লেখায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'নশিয়া' (১৯৩৮) ও 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস' (১৯৪৩) প্রভৃতি লেখাকে সার্ত্রের প্রথম পর্বের লেখা বলে মনে করা হয় এবং 'হোয়াট ইজ লিটেরেচার?' (১৯৪৭) ও 'ক্রিটিক অব ডায়ালেকটিকাল রিজন' (১৯৬০) প্রভৃতি লেখাকে সার্ত্রের দ্বিতীয় পর্বের লেখা বলে হয়। উভয় পর্বের লেখায় আলাদা আলাদা মত লক্ষ্য করা যায়। হয়তো এই কারনেই মনে করা হয় যে, সার্ত্র চূড়ান্ত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। চূড়ান্ত স্বাধীনতাকে তিনি রীতিমত চর্যায় প্রতিফলিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,

১৯৬৪ সালে সার্ত্র্ নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তার আগে ১৯৪৫-এ তিনি ফরাসি সরকারের 'লিজিয়ঁ দ্য' নার' প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল। ..... পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের ঘটনা থেকে বোঝা যায় সার্ত্র্ কতটা স্বাধীনচেতা ছিলেন। .....কোনো পুরস্কার গ্রহনের মাধ্যমে তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে

উঠতে চান নি। তিনি বলেন নোবেল পুরস্কার তিনি যেমন প্রত্যাখ্যান করেছেন তেমনি যদি তাঁকে লেনিন পুরস্কার দেওয়া হতো তিনি তা-ও নিতে সম্মত হতেন না।[14]

২.৪) সিমনের অস্তিবাদঃ-> **সার্ত্রেও সিমন-এর মধ্যে একজনকে ছেড়ে আর একজনকে অনুধাবন করা অসম্ভব। একই সঙ্গে তাঁদের জীবনের পথ চলার সূত্রপাত। শুরু হয় তাঁদের পৃথিবীকে জানার ও বুঝে নেওয়ার পালা।**[15]

সিমন ও সার্ত্রেকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। তাঁদের দর্শনের বহুলাংশ একে অপরের মত দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত এবং মনে হতে পারে যে, উভয়ে একই কথা বলছেন। গুরু-শিষ্য পরম্পরা সম্বন্ধে আবদ্ধ সিমন তাঁর আত্মজীবনীতে দাবী করেন যে, তিনি কেবলমাত্র সার্ত্রের দেখানো পথ অনুসরণ করেছেন মাত্র, নতুন কোনো দর্শনের সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু তা ঠিক নয়।

Bargoffen-এর ভাষায়,

.....I remember that this writer who refuses to call herself a philosopher is an untrustworthy narrator when it comes to exposing her philosophical venture.[16]

কিন্তু তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, তিনি সার্ত্রের দর্শন থকে বহুলাংশে সরে এসেছেন এবং তিনি যে অস্তিবাদী দর্শনের প্রচলন করেন

---

[14] তদেব, পৃ.৪৯।

[15] তদেব, পৃ.১৯।

[16] Bergoffen, Debra B. 1997. *The Philosophy of Simone De Beauvoir Gendered Phenomenologies, Erotic Generosities.* Unite states of America: State University of New York Press, Albany. P.75.

তা নারীবাদী অস্তিবাদী দর্শনের ভিত প্রস্তুত করে। Joseph mohan –এর ভাষায়,

The first is that by early 1947 de Beauvoir has completed her own version of existentialism: this existentialism, I want to stress is hers and hers alone.[17]

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সিমন দ্য বোভায়ার হলেন প্রথম মহিলা যিনি অস্তিবাদী দর্শনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। শৈশব থেকে তাঁর জীবনকে কতকগুলি স্পষ্ট অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। সার্ত্রের সাথে আলাপ তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অধ্যাপিকা শেফালী মৈত্রকে অনুসরণ করে বলা যায় যে,

সিমন-এর জীবনের প্রথম পর্বান্তর ঘটেছিল যখন তিনি খ্রিস্টধর্ম-বিশ্বাস থেকে এক্সিসটেনশিয়ালিজম-এ পৌঁছে গেলেন। এই দ্বিতীয় পর্বে সিমন দৃঢ়ভাবে সার্ত্র-র সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। তাঁরা দুজনেই মানব জন্মের অনিত্যতা বা 'কনটেনজেন্সি'-তে বিশ্বাসী ছিলেন, আর আস্থা ছিল মানুষের চূড়ান্ত 'ফ্রিডম' বা স্বাধীনতায়। ..... সিমন-এর জীবনের তৃতীয় পর্বে যে মাত্রাটি যুক্ত হল সেটি তাঁর ইতিহাসবোধ। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ইতিহাস ও রাজনীতি একযোগে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। এই মিলিত প্রভাবের উপস্থিতিতে মানব জীবনের 'ফ্রিডম' অর্জন করতে হয়।..... সিমন-এর জীবনের চতুর্থ একটি

[17] Mohan, joseph. 1997. *Existentialism, Feminism and Simone de Beauvoir*. Great Britain: Macmillan Press LTD. P.186.

পর্বও শনাক্ত করা যায়। এই পর্বে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বৃদ্ধ বয়েসের 'লিভড এক্সপিরিয়েন্স' বা যাপিত অভিজ্ঞতার কথা লেখেন।[18]

সব অস্তিবাদী চিন্তাবিদদের মতো সিমনও 'Existence precedes Essence' বা 'অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্ববর্তী' এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ভাষায়,

He is still a part of this world of which he is a consciousness. He asserts himself pure internality against which no external power can take hold, and he also experiences himself as a thing crushed by the dark weight of other things. At every moment he can grasp the non-temporal truth of his existence. But between the past which is no longer is and the future which is not yet, this moment when he exist is nothing..... In turn an object for others, he is nothing more than an individual in the collectivity on which he depends.[19]

স্বাভাবিকভাবেই অস্তিবাদী দর্শন স্বাধীনতা (Freedom), সততা (Authenticity), এবং দায়িত্ববোধ (Responsibility) ইত্যাদির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। একথা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে জন্মগ্রহন করে এবং সেই জন্মগ্রহনের সূত্র ধরে কিছু সম্পর্ক, গুণাবলী তার উপর চাপানো হয় যেগুলির তার কোন পছন্দ অপছন্দ ধার ধারে না। সিমনের ভাষায়,

---

[18] মৈত্র, ২০১৩, *উজানি মেয়ে: সিমন দ্য বোভায়ার-এর জীবন ও দর্শন*, পৃ.৫৩।

[19] Beauvoir, Simone de. 1948. Translated by Bernard Frechtman. *The Ethics of Ambiguity.* New York: Citadel Press Kensington Publishing Crop. P.7.

In his eyes, human inventions, words, customs, are values are given facts, as inevitable as the sky and the trees. This means that the world in which he lives is a serious world, since the characteristic of the spirit of seriousness is to consider values as ready-made things.[20]

সিমন সম্পর্ক, অবস্থান, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে পূর্বনির্ধারিত বলে চিহ্নিত করেছেন। এগুলিকে তিনি 'Ready-made things' বলে অভিহিত করেছেন। এই পটভূমিকায় স্বাধীনতা' বলতে কী বুঝবো? সার্ত্রের মতো সিমনও মনে করেন যে, পরিস্থিতি, সিমন যাকে 'ফ্যাক্টিসিটি' (Facticity) বলেছেন, তার থেকে উত্তরণই হল স্বাধীনতা অভ্যাসের প্রতীক। কিন্তু প্রশ্ন হল 'ফ্যাক্টিসিটি' বলতে কী বোঝায়? সিমনের ভাষায়,

Every man is originally free, in the sense that he spontaneously casts himself into the world. But if we can-sider this spontaneity in its facticity, it appears to us only as a pure contingency,[21] তিনি আবার বলছেন,

From the very beginning, existentialism defined itself as a philosophy of ambiguity. It is affirming the irreducible character of ambiguity that Kierkegaard opposed himself to Hegel, and it is by ambiguity that, in our own generation, Sartre, in *Being and Nothingness,* fundamentally defined man, that being whose being is not to be, that subjectivity which realizes

[20] Ibid, p.35.

[21] Ibid, p.25.

itself only as a presence in the world, that engaged freedom, that surging of the for-oneself which is immediately given for others.[22]

তবে ফ্যাক্টিসিটি থেকে উত্তরনের উপায় কী? যেহেতু সিমন পূর্বনির্ধারিত যে কোনো বিষয়কে অস্বীকার করে তাই তাঁর মতে, প্রকল্প (Project) গঠনই হল স্বাধীনতার পথে উত্তরনের প্রতীক। আবার প্রশ্ন হতে পারে, কী জাতীয় প্রকল্প? তিনি বলেন, নিজের ইচ্ছা, স্বাধীনতা পছন্দ অনুসারে প্রকল্প গঠন করা যায়। তিনি ফ্যাক্টিসিটিকে অস্বীকার করছেন না এবং তাঁর মতে, তাকে কোনোভাবে অস্বীকার করাও সম্ভব নয় বরং তার থেকে উত্তরনের কথা বলছেন। তবে এই উত্তরনের সাথে এক ধরণের অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ ব্যক্তিকে ঘিরে থাকে। সার্ত্র ও সিমন উভয়েই চূড়ান্ত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তবে সিমনের দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 'চান্স' বা আপাতনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। পরস্থিতি সাপেক্ষতার নিরিখে বলা যায় যে, একটি পরিস্থিতির অনেকগুলি মাত্রা হয়। এই মাত্রার অন্যতম হল 'চান্স'।

আমাদের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া একমাত্র স্বাধীন নির্বাচনের উপর নির্ভর করে না, এ ক্ষেত্রে 'চান্স'-এরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ..... সিমন বলেন প্রতিটি জীবনের ইতিহাসকে কতকগুলি ধারণা এবং বিশ্বাসের নিরিখে পরীক্ষা করতে হয়। তাঁর নিজের জীবনেতিহাস বোঝার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যায় 'চান্স'-এর ধারণার মধ্যে।[23]

---

[22] Ibid, P.9-10.

[23] মৈত্র, ২০১৩, *উজানি মেয়ে: সিমন দ্য বোভায়ার-এর জীবন ও দর্শন,* পৃ.৬১।

চান্সের কথা বলতে গিয়ে যে প্রশ্নটি ওঠে সেটি হল চান্স ও ফ্যাক্টিসিটির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আপাতদৃষ্টিতে তো উভয়কেই একই মনে হয়। কেননা জীবনে চলার পথে চান্স ও ফ্যাক্টিসিটি উভয়কেই আমাদের স্বীকার করতে হয় বা মেনে নিতে হয় (কেননা উভয়কে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই)। যেমন ফ্যাক্টিসিটি আমাদের স্বাধীনতাকে পরোয়া করে না তেমনই চান্সও তেমনি আমাদের পছন্দ অপচ্ছন্দকে পরোয়া করে না। তাহলে যে প্রশ্নটি আবশ্যক সেটি হল উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অন্য ভাষায় সিমন চান্স ও ফ্যাক্টিসিটি বলে দুটি শব্দ ব্যবহার করলেন? সিমনের লেখা পড়লেই স্পষ্টতই উপলব্ধ হয় যে শব্দ দুটির মধ্যে একটি সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে। প্রথমত, ফ্যাক্টিসিটি কোন ভাবেই আমাদের স্বাধীনতার সাথে যুক্ত নয়, বরং এটি আমাদের স্বাধীনতার পরিপন্থী। তবে একে অস্বীকার করাও যায় না। অপরদিকে চান্সের সাথে স্বাধীনতার সুনিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। স্বাধীন ভাবে প্রকল্প গ্রহণ করার পর যা আমাদের প্রকল্পকে সমৃদ্ধ বা প্রকল্পের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করে তাদের তিনি চান্স বলেছেন। যেমন- রাস্তায় বৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিটিকে আমি বদলাতে পারব না। ফলে এটি হল ফ্যাক্টিসিটি এবং এই পরিস্থিতিতে আমি একটি স্থানের সন্ধান পেলাম যেখানে আমি বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় নিতে পারলাম। সেটি হল চান্স। এমন হতেই পারত যে, আশ্রয়টি আমি নাও পেতে পারতাম। কিন্তু তাতে আমার প্রকল্পের কোনো হানি হত বলে মনে হয় না। চান্সের কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর জীবনকে উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছেন। যেমন তাঁর জন্ম একটি

‘সামাজিক সুবিধাভোগী’ পরিবারে সেটা একধরণের চান্স, নৈতিক করা শাসন থেকে মুক্তি, দারিদ্রতার সাথে মোকাবিলা করাও একধরণের চান্স। চান্সগুলিকে কী ভাবে কাজে লাগানো হবে সেটা ব্যক্তির নিজস্ব প্রকল্প। এই খানেই আসছে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। পুর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিমন নিজের জীবনকে তাঁর লেখায় উপমা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। চান্স বা আপাতন প্রসঙ্গেও তিনি নিজের জীবনকে উপমা হিসাবে দেখিয়েছেন।

সিমন-এর স্বাধীন জীবনযাপনের মূলে এই আপাতনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিমন সবিস্ময়ে ভাবেন -- সার্ত্র-র সঙ্গে পরিচয় না হলে তিনি কি নিজেকে এইভাবে গড়ে তুলতে পারতেন। এছাড়া সিমন-এর এমন অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল যাঁরা তাঁর জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে প্রভাবিত করে। এঁদের সঙ্গে পরিচয় না হলে সিমন-এর জীবন অন্য খাতে বইত। যেমন জাজা-র সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা নিছকই একটি আকস্মিক ঘটনা। জাজা ছিলেন সিমন-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁর কাছ থেকেই সিমন স্বাধীন যাপনের শিক্ষা পেয়েছিলেন। [24]

তিনি চান্স ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতাকে জাহির করতে গেলে চান্স গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। কেননা চূড়ান্ত স্বাধীনতা দ্বারা সব কিছু করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এমন কথা বলা যায় না যে আমরা সব ক্ষেত্রে স্বাধীন।

তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে আমাদের জানাচ্ছেন যে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তিনি মজ্জায় মজ্জায় তাঁর সমসাময়িকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন এবং এই যুক্ত হয়ে থাকার ফলে তাদের

[24] তদেব, পৃ.৬১-৬২।

প্রতি তাঁর একটা দায় বর্তাচ্ছিল। এর থেকে তাঁর মুক্তি ছিল না। ফলে তিনি সব অর্থেই স্বাধীন নন।[25]

আজীবন অঙ্গীকারহীন সম্পর্কে সম্পর্কিত থেকেও সার্ত্র ও সিমন একে অপরের স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ সন্মান প্রদর্শন করেন। এমনকি উভয়েরই একাধিক অন্তরঙ্গ সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ারও স্বাধীনতা ছিল। এক্ষেত্রে একে অপরকে ঠকানোর বা বিশ্বাসভঙ্গতার প্রসঙ্গ ওঠে না কেননা তারা সম্পর্কের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ না হলেও একে অপরের কাছে সব কিছু বলবেন বা কিছুই অপরের কাছে গোপন করবেন না এই বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একে অপরের কাছে এই অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা কী অস্তিবাদের বিরুদ্ধাচরন করার মত নয়? এর উত্তরে বলা যায় যে, এই অঙ্গীকার বদ্ধ থাকাটা অপরের স্বাধীনতাকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার দ্যোতক। কিন্তু এই জাতীয় সম্পর্কে অঙ্গীকারবদ্ধ জীবন-যাপন যে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য তাও স্বীকার করেছেন।

সিমন পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন যে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা নৈঃশব্দ্যকে আশ্রয় করে থাকে, ভাষার একটা নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে। সিমন মনে করতেন যে ভাষা সর্বদা জগতের 'ফিজিকাল এসেন্স' বা প্রাকৃতিক সত্তাকে প্রকাশ করতে পারে না। কমিউনিকেশন বা সঞ্চারে স্বচ্ছতা এবং যুগ্মতার একটি সীমা আছে।..... প্রত্যেক ব্যক্তির কতকগুলি স্বকীয় অভিজ্ঞতা আছে যা অপরের সঙ্গে ভাগ করা যায় না।[26]

[25] তদেব, পৃ.৬২।

[26] তদেব, পৃ.৫৫।

হয়তো এই কারনেই সার্ত্র এবং সিমনের বিশিষ্ট ছাত্রী অলগা–র সাথে সার্ত্রের সম্পর্ককে মেনে নিতে সিমনের যথেষ্ট সমস্যা হয়েছিল। এবং এই ত্রিকোণ সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অস্তিবাদী ভাবধারা থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি অলগার প্রতি নিজের হিংসাকে ব্যাখ্যা করেছেন প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে। তিনি অলগাকে সার্ত্র এবং তাঁর কন্যারূপে মনে করে নিজেকে সান্তনা দিয়েছেন। অথচ সার্ত্র এবং সিমন আজীবন প্রাতিষ্ঠানিক যে কোনো সম্পর্ককে ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অস্তিবাদী দর্শন চর্চা করা এবং তাকে চর্যায় প্রতিফলিত করা কষ্টসাধ্য।

একথা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে জন্মগ্রহন করেন। পরিবেশ বা সমাজকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। ফলত ব্যক্তি এবং 'অপর' (ব্যক্তি ভিন্ন যে কোন ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে 'অপর' পদবাচ্য) উভয় উভয়কে নিজেদের দৃষ্টি অনুসারে দেখে। ফলত এই পরিস্থিতি থেকেই সৃষ্টি হয় জীবনের 'দ্বিমুখী দোলাচল', যা উদ্বেগের (Anxiety) সমতুল্য। তদকালীন সমাজে (বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ চল্লিশের দশকে) সিমন ও সার্ত্রের জীবনশৈলী তদকালীন সমাজ এমনকি বর্তমান সমাজকেও ভাবিয়ে তোলে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের গতিধারার বিপরীতে চলা সমস্ত ব্যক্তি সমাজের কুনজরে পড়ে। তাদের ব্রাত্য করেও রাখা হয়। ফলে যে সমস্যার সন্মুখীন হতে হয় তা হল ব্যক্তি ও অপরের দেখা জগতের আদল পুরোপুরি বদলে যায়। পুনরায় যে সমস্যা মাথাচারা দিয়ে ওঠে তা হল – যদি ব্যক্তি ও

অপরের দেখা জগতের মধ্যে কোন মেলবন্ধন সম্ভব না হয় তবে সিমনের দর্শন কী কেবল নিজের কথাই বলে? অপরের অবস্থান তবে কী? উক্ত প্রশ্ন গুলি সম্পর্কে সার্ত্রে সন্দিহান ছিলেন সিমন নয়। কেননা তিনি এক প্রকার যোগসূত্র স্থাপন করেছেন ব্যক্তির প্রকল্পে অপরকে স্থান দিয়ে। সেই জন্যই তিনি 'আমাদের প্রকল্প' (WE project) বলাতে বেশী আগ্রহী।

২.৫) সার্ত্রে ও সিমনের দর্শনের পার্থক্যঃ-> সার্ত্রের মতো সিমনও মনে করেন যে, ব্যক্তি তাঁর নিজের জীবনের জন্য নিজেই দায়ী এবং ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য হল প্রকল্প গঠন যার মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতা জাহির করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। একথা অনস্বীকার্য যে, সার্ত্রে ও সিমনের দর্শনের মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। একদিকে সার্ত্রে ব্যক্তির প্রকল্প গঠনকে সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধির দ্যোতক বলেছেন, কিন্তু সিমন ব্যক্তির প্রকল্প গঠনকে কখনোই প্রতিনিধিত্ব করা বলেন নি। যদি সার্ত্রের দর্শনকে অনুধাবন করা হয়, তবে বোঝা যায় যে, "he is responsible for all men"-এর দ্বারা তিনি একটি প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার (Power) খেলাকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ এক অর্থে প্রকল্প গঠনকারী ব্যক্তি প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির তুলনায় উন্নত। ফলত অনেক নারীবাদী দার্শনিক (বিশেষত সিমনের অনুগামীরা) দাবী করেন যে, সার্ত্রে যেন দেকার্তের দ্বিকোটিক বিভাজনকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন নি, তিনি কেবল অস্বীকৃতি মূলক দাবী করে গেছেন। একই সঙ্গে স্বাধীনতার

ধারণাকে সার্ত্রে এমন স্তরে উন্নীত করেছেন যে, অনেকেই মনে করেন, প্রকল্প গঠন করার ফলে ব্যক্তি নিজেকে স্রষ্টা (Creator) রূপে কল্পনা করে। অপরদিকে সিমনের দর্শনে এই বিষয় গুলির অনুপস্থিত। প্রথমতঃ সিমন ব্যক্তির প্রকল্প গঠনকে কোনোভাবেই 'প্রতিনিধিত্ব' করা বোঝান নি। ফলত, যে প্রশ্নটি ওঠে সেটি হল, সিমনের দর্শন কী নিঃসঙ্গতার বা আত্মকেন্দ্রিকতার শিক্ষা দেয়? আপাতদৃষ্টিতে এমন মনে হলেও আদতে তা নয়। কেননা তিনি মনে করেন যে, 'মানবজাতির প্রতিনিধি' হল 'ঐকাগ্র্য ব্যক্তির' (Seriousman) নামান্তর। আর সার্ত্রের দর্শনে ঐকাগ্র্য ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। কিন্তু সিমন ঐকাগ্র্য ব্যক্তি বা Seriousman-এর ঘোরতর বিরোধী। প্রশ্ন হল ঐকাগ্র্য ব্যক্তি বলতে কী বোঝায়? সিমনের ভাষায়,

The serious man gets rid of his freedom by claiming to subordinate it to values which would be unconditioned. He imagines that the accession to these values likewise permanently confers values which would be unconditioned. He imagines that the accession to these values likewise permanently confers value upon himself. Shielded with "rights", he fulfills himself as a *being* who is escaping from the stress of existence. The serious is not defined by the nature of the ends pursued.[27]

সিমনের কাছে, ব্যক্তি কোনো প্রতিনিধি রূপে নয়, বরং নিজের বুদ্ধি, যাপিত অভিজ্ঞতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি অনুসারে প্রকল্প গঠন করে এবং সেই

[27] Beauvoir. 1948. Translated by Frechtman. 1948. *The Ethics of Ambiguity.* P.46.

প্রকল্পের যথার্থ রূপদানের চেষ্টা করে এবং সেই প্রকল্পের সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং তজ্জনিত উদ্বেগ (Anxiety) সে উপলব্ধি করতে পারে। 'উদ্বেগ' বলতে সেই প্রকল্পের যথার্থ রূপদান সম্ভব হবে কী না, অপরে সেই প্রকল্পকে কিভাবে নেবে, এই প্রকল্পের দ্বারা সে অপরের স্বাধীনতা লঙ্ঘন করেছে কী না, অপরের স্বাধীনতাকে সন্মান দিয়ে কিভাবে নিজে স্বাধীন ভাবে প্রকল্প গঠন করা যায়, সর্বোপরি ব্যক্তির প্রকল্পে যে ঐকাগ্র্য ব্যক্তির ছায়া বর্জিত তার প্রমাণ ইতাদি বিষয়ে একধরণের দোলাচল চলতেই থাকে। এক্ষেত্রে এক ধরণের অনিশ্চয়তাও থাকে। সিমন চূড়ান্ত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এমনকি তিনি মনে করেন যে, চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তার স্বাধীনতা জাহির করতে পারে। অর্থাৎ স্পষ্টতই উপলব্ধ হয় যে, সিমন স্বাধীনতার কোন সীমানা নির্দেশ করেন নি। তবে তিনি স্বাধীনতা বলতে যা খুশি তাই করাকে বোঝান নি। তবে কেবল চূড়ান্ত স্বাধীনতা দিয়ে যে কিছুই হবে না এই কথাও তিনি বলেছেন। সার্ত্র মনে করতেন যে ব্যক্তি চূড়ান্ত স্বাধীনতা দ্বারা সব কিছু করতে পারে। তাঁর কাছে চুড়ান্ত স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তিই শেষ কথা। ব্যক্তির প্রকল্পে অপরের অবস্থান সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন। কেননা তিনি মনে করতেন যে, একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা জাহিরের অর্থ হল অপর ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খর্ব করা। ফলে ব্যক্তি ও অপরের স্বাধীনতার মেলবন্ধন কী ভাবে সম্ভব? সার্ত্রে এই সমস্যার কোনো উত্তর দেন নি।

সার্ত্র্ বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর নিজের মুক্তির জন্য অপরের মুক্ত অবস্থান প্রয়োজন, অথচ আর সকলে তো মুক্ত নয়। সকলের মুক্তি বলতে তিনি ব্যক্তির মুক্তির যোগফলের কথা বলেননি। সকলের মুক্তি মানে গোষ্ঠীগত মুক্তি।.....তাঁর মনে হয়েছিল যে সকলের 'সলিড্যারিটি' বা সংহতি স্থাপন করতে হলে তিনি তার চাপ নিতে পারবেন না, অথচ তিনি একক ভাবেও মুক্ত হতে পারবেন না।[28]

তবে সিমনের দর্শনে এই সমস্যা হয় না কেননা তিনি 'আমার প্রকল্প' বলার তুলনায় 'আমাদের প্রকল্প' ('WE' Project) বলার পক্ষপাতী ছিলেন। ফলত সার্ত্রের মতো সমস্যা তাঁর দর্শনে হয় নি। অনেক সিমনের অনুগামী নারীবাদী দার্শনিক মনে করেন যে, সার্ত্রের *Being and Nothingness*-এর অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর সিমনের লেখায় পাওয়া যায়। যেমন – সার্ত্রে এবং সিমন উভয়েই মনে করতেন যে, মানুষ জন্ম থেকেই স্বাধীন এবং উভয়ের মতে, নৈতিক যে কোন কাজ করার জন্যও স্বাধীনতা আবশ্যক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মন্দ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মানুষ নিজের কাজ করে না। তবে প্রশ্ন ওঠে যে, মানুষ কী আদতে স্বাধীন? সার্ত্রে এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। অপরদিকে সিমনের এই সমস্যা সমাধান করতে কোন অসুবিধা হয় না কেননা সিমন স্বাধীনতাকে দুভাগে ভাগ করেছেন। একটি ভাগ হল সত্তাগত দিক থেকে স্বাধীন (Ontological freedom) এবং অপরটি হল নৈতিক দিক থেকে স্বাধীন (Moral Freedom)। সার্ত্রে স্বাধীনতা বলতে প্রথম ভাগটিকে বুঝিয়েছেন এবং সিমন দ্বিতীয়টিকে। ফলত সার্ত্রের দর্শনে স্ববিরোধীতার প্রসঙ্গ ওঠে। ১)

[28] মৈত্র, ২০১৩, *উজানি মেয়ে: সিমন দ্য বোভায়ার-এর জীবন ও দর্শন*, পৃ.৪।.

কেন মানুষ নিজের স্বাধীনতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়? ২) তবে মানুষ জন্ম থেকে স্বাধীন বলার অর্থ কি দ্বারায়? ৩) যদি মানুষ জন্ম থেকেই স্বাধীন হয় তবে কেন মানুষ তার স্বাধীনতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়? ৪) কেন অন্যের মত অনুসারে কাজ করে কেন ইত্যাদি প্রশ্ন গুলি ওঠা আবশ্যক। কিন্তু সিমন মনে করেন যে, মানুষ সত্তাগত দিক থেকে নয় বরং নৈতিক দিক থেকে স্বাধীন এবং নৈতিক স্বাধীনতা সত্তাগত স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে।

সিমন এবং সার্ত্রের দর্শনের অপর একটি পার্থক্য হল 'দেহের অবস্থান'-কে নিয়ে। সিমন আদৌ এই বিষয়ে অবগত ছিলেন কিনা তা প্রশ্নাতীত। সিমন মনে করতেন প্রকল্প গঠনের সাথে দেহের একটি যোগ আছে। ব্যক্তি দৈহিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে প্রকল্প গঠন করে। তবে সার্ত্রে শরীরকে 'কতকগুলি রেখাঙ্কিত পেশির পিণ্ড' বলে মনে করতেন। কিন্তু সিমন তা মনে করতেন না। দেহ বা শরীর সম্পর্কে উভয়ের মত ভিন্ন ভিন্ন। শেফালী মৈত্রকে অনুসরণ করে বলা যায় যে,

চোখের জল ফেললে, সমুদ্র যাত্রায় বমিবমি লাগলে বা স্নায়ু-শৈথিল্য দেখা দিলে সার্ত্র্ বলতেন, 'ওটা দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু না'। সিমন তা মনে করতেন না। সিমন মনে করতেন যে পাকস্থলী, অশ্রুগ্রন্থি, এমনকি মস্তিষ্কও আমদের নিয়ন্ত্রনে সবসময় চলে না। আমরা নিয়ন্ত্রন করতে চাইলেও অতি উদ্বেগে মাথাযন্ত্রণা হয় অর্থাৎ আমাদের তখন নিয়ন্ত্রন করে শরীর। [29]

[29] তদেব,পৃ.৬৩।

সমাজ জীবনে বা প্রাত্যহিক জীবনে ঐকাগ্র্য ব্যক্তি বা serious man-এর প্রভাব প্রবল। ঐকাগ্র্য ব্যক্তি হল একটি নিরাপদ ছাতার মতো, যার আশ্রয়ে ব্যক্তি নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করে এবং সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঐকাগ্র্য ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তিকে ভুল বোঝায় ও তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে, সিমন যাকে **Mystification** বলেছেন। ঐকাগ্র্য ব্যক্তি নিজে স্বাধীনভাবে প্রকল্প গ্রহণ করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হল, সাধারণ ব্যক্তি কী আদৌ ঐকাগ্র্য ব্যক্তির প্রকল্পে ইচ্ছাধীন ভাবে যুক্ত নাকি তাকে জোর বা ভুল বুঝিয়ে নিজের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি ঘটানোর চেষ্টা করে? সিমনের মতে, ঐকাগ্র্য ব্যক্তির ভুল বোঝানোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একজন ব্যক্তি ঐকাগ্র্য ব্যক্তির প্রকল্পকে নিজের প্রকল্প বলে মনে করে এবং নিজেকে স্বাধীন বলেও মনে করে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিমন বলেছেন,

Man's unhappiness, says Descartes, is due to his having first been a child. And indeed the unfortunate choices which most men takes can only be explained by the fact that they have taken place on the basis.[30]

মানুষের প্রধান সমস্যা হল সে শৈশবকে অতিক্রম করতে চায় না, শৈশবের নির্ভরতাকে অস্বীকার করতে চায় না এবং স্বাধীন ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় না। সর্বদা এক বা একাধিক ব্যক্তি বা তন্ত্রের অধীনে থাকতে পছন্দ করে। প্রকল্প গ্রহণে অনীহার দ্বিতীয় কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

[30] Beauvoir. 1948. Translated by Frechtman. *The Ethics of Ambiguity.* P.35.

বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির এই বোধই না থাকে যে প্রকল্প বলতে কী বোঝায় বা কীভাবে তা গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ আমার যদি প্রকল্প গ্রহণ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই না থাকে তবে কী রূপে উত্তরন সম্ভব? এই প্রসঙ্গে সিমন মুসলিম হারেমে অবস্থিত মেয়েদের কথা উল্লেখ করেছেন। যাদের হারেমের অবদমন সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। তারা ঐ স্থানকেই নিজেদের উপযুক্ত বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'তোতাকাহিনী' গল্পের 'খাঁচা'-টিকে উপমা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। খাঁচা 'সোনার' হোক বা 'লোহার' হোক আদতে তো 'খাঁচা'। কিন্তু প্রশ্ন হল যদি কারোর 'খাঁচা' সম্পর্কেই কোন বোধ না থাকে? সমগোত্রীয় কথা পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় অবস্থিত মেয়েদের ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা যায়। বিশেষত নিম্নবিত্ত মহিলা (যারা অন্যের বাড়িতে পরিচারিকাবৃত্তি করে) তারা নিজেদের অবদমন সম্পর্কে সবসময় অবগত নয়। মজার ব্যাপার হল যদি তাদের সেই বিষয়ে অবগত করানর চেষ্টা করা হয় তবে তাদের স্পষ্ট যুক্তি হল এটাই তাদের নিয়তি। সিমন আমাদের বার বার জানাচ্ছেন যে, যদি জীবন ঐকাগ্র্য ব্যক্তির ভাবধারায় অর্পণ করা হয় তবে সেই ব্যক্তির 'মুক্তি' বা উত্তরন সম্ভব নয়। উত্তরনের একমাত্র পন্থা হল প্রকল্প গঠন এবং তাকে যথাযথ রূপ দান করা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি 'নৈতিক স্বাধীনতার' কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঐকাগ্র্য ব্যক্তির বশবর্তী হয়ে বা ঐ ব্যক্তির মতকে নিজের মত বলে মনে করাকে তিনি 'মন্দ বিশ্বাস' বা Bad Faith বলেছেন। ব্যক্তি প্রকল্প গঠনের দ্বারা মন্দ বিশ্বাস থেকেও উত্তরিত হতে পারে। মন্দ বিশ্বাস বা Bad Faith-এর

কথা সার্ত্রও স্বীকার করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিমন ও সার্ত্র উভয়েই মনে করেন যে, মানুষ জন্ম থেকেই মুক্ত (Man is born to free)। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, মন্দ বিশ্বাসের বশবর্তী হয় কী ভাবে? বা মন্দ বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়? মন্দ বিশ্বাস বলতে সিমন বুঝিয়েছেন,

Thus, human spontaneity always project itself towards something..... Now, I can evade this choice. We have said that it would be contradictory deliberately to will oneself not free. But one can choose not to will himself free. In laziness, heedlessness, capriciousness, cowardice, impatience, one contests the meaning of the project at the very moment that one defines it. The spontaneity of the subject is then merely a vain living palpitation, its movement towards the object is a flight, and itself is an absence.[31]

সিমন ও সার্ত্রে উভয়েই মন্দ বিশ্বাস থেকে বেড়িয়ে এসে নিজস্ব প্রকল্প গঠনের মাধ্যমে উত্তরনের কথা বলেছেন। সিমন ও সার্ত্রের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একে অপরের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন নয়। Bergoffen-এর ভাষায়,

Tracing the development of Beauvoir's muted voice I discover that though it is wrong to read her merely as echo of Sartre, it is also mistake to read her without reference to Sartre.[32]

---

[31] Ibid. P.25-26.

[32] Bergoffen. 1997. *The Philosophy of Simone De Beauvoir Gendered Phenomenologies, Erotic Generosities.* P.12.

২.৪) নারীবাদী অস্তিবাদী দর্শনঃ-> সিমনকে কী অস্তিবাদী নারীবাদী দার্শনিক বলা যায় বা সিমনের দর্শন কী অস্তিবাদী নারীবাদী দর্শন? উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সিমনের শৈশবের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা আবশ্যক। শৈশবে সিমনের জীবন কেটেছে দুটি বিপরীত ধর্মী ভাবধারায় – সিমনের পিতা ছিলেন নাস্তিক (ঈশ্বর অবিশ্বাসী) এবং তাঁর মাতা ছিলেন কট্টর খ্রিস্টীয় ভাবধারার বশবর্তী। সুতরাং দুটি বিপরীত ভাবধারার প্রভাব যে তাঁর মধ্যেও পড়ে তা নিঃসংকোচে বলা যায়। এতদসত্ত্বেও ১৪ বছর বয়েসে সে ঈশ্বরের অনস্তিত্বের কথা দাবী করেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। সুতরাং বলা যায় যে, শৈশব থেকেই অস্তিবাদের বীজ তার মধ্যে সুপ্তাবস্থায় ছিল। কঠোর পারিবারিক পরিকাঠামোর মধ্যে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। শৈশবে কোন কাজ করতে গেলে নানান বাঁধার সন্মুখীন হতে হত। তখন তিনি মনে করতেন যে, তিনি ছোটো বলে তাঁকে ঐ জাতীয় কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু পরে তিনি উপলব্ধি করেন যে, পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামো নারীর কার্যসিদ্ধিতে সর্বদা বাঁধা সৃষ্টি করে – যা তাঁর বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থ *The Second Sex*-এর ভিত প্রস্তুত করে।

পরবর্তী কালে সিমন যে অস্তিবাদী দর্শনের একজন প্রধান মুখ হয়ে উঠলেন তা নিঃসংকোচে বলা যায়। সার্ত্রের সাথে জীবন ব্যাপী সম্পর্কও তাঁর দর্শনকে প্রভাবিত করে – মূলত নারীবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

উনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সার্ত্রের Being and Nothingness –এর তত্ত্বকাঠামোর পরিধির ভিতর থেকে তিনি নারী মুক্তির পথ বাতলাচ্ছেন। .....কেউ বলেন সার্ত্রের Being and Nothingness–এর ব্যক্তব্য খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় তাঁর বক্তব্য নারী মুক্তির পরিপন্থী, বিশেষ করে সার্ত্রে তাঁর রচনায় যেখানে বিবর ও শ্যাওলার উল্লেখ করেছেন সেখানে স্পষ্টই মনে হয় নারীর দেহ সম্বন্ধে তিনি কটাক্ষ করেছেন এবং বারবার বলেছেন যে, এই অবস্থা থেকে মানুষের মুক্তি পেতে হবে। .....সার্ত্রের তত্ত্বকাঠামোকে ছাপিয়ে একটি নারীবাদী বিশ্লেষণী কাঠামো প্রয়োগ করেছেন সে সম্পর্কে তিনি নিজেই অবগত ছিলেন না।[33]

অস্তিবাদী নারীবাদ যে সমস্ত বিষয় বা ধারণা গুলির উপর আলোকপাত করে সেগুলি হল স্বাধীনতা (Freedom), আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক (Interpersonal Relationship), নারীর যাপিত অভিজ্ঞতা (Lived Experience of Woman) এবং শরীর (Body)। সিমনের দর্শনে সবকটি ভাবধারার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ সিমনের অস্তিবাদ যে নারীবাদী তত্ত্ব কাঠামোয় অস্তিবাদের বিশ্লেষণ তা হলফ করেই বলা যায়।

[33] মৈত্র, ২০০৩, *নৈতিকতা ও নারীবাদ: দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা*, পৃ.২০৮।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিকতা : 'অনিশ্চিত' নৈতিকতা

৩.১) ভুমিকাঃ-> পূর্বনির্ধারিত কোনো তত্ত্বকে স্বীকার না করে কীভাবে নৈতিকতাকে উপস্থাপন করা যায় এই আপত্তিটি অস্তিবাদী দার্শনিকদের বিপক্ষে সাধারনত ওঠে। অনেকে আপত্তি তুলে বলেন যে, অস্তিবাদী দার্শনিকদের পক্ষে নৈতিকতা সম্বন্ধিত কোনো মত স্থাপন করা সম্ভব নয়। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল অস্তিবাদী ভাবধারায় বিশ্বাস রেখে কীভাবে নৈতিকতাকে স্থাপন করা যায় তার প্রতি আলোকপাত করা, বিশেষত সিমন দ্য বোভায়ারকে অনুসরণ করে।

নৈতিকতা সম্বন্ধিত আলোচনার সূত্র ধরে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে আগে মনে আসে সেটি হল : নৈতিকতা বলতে কি বোঝায়? বা কোন পরিস্থিতিতে নৈতিকতা প্রয়োজন হয়?

সাধারনত নৈতিকতা বলতে বোঝানো হয় কতকগুলি নীতি (Rules), যা প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের (Conflict) সাথে মোকাবিলা করতে আমাদের সাহায্য করে এবং কোন্ কাজটি যথার্থ (Right) সেটি নির্ণয়ে সাহায্য করে। কম বেশি সমস্ত সমাজেই কিছু না কিছু নীতি আছে যা সমাজের অন্তর্গত সকলেই মেনে চলে। তাহলে যে প্রশ্নটি আসে সেটি হল : যদি সকলেই সেই নীতি গুলিকে মান্য করে চলে, তবে নৈতিকতা কেন প্রয়োজন হয়? সাধারনভাবে,

প্রচলিত নীতিগুলি যখন পরস্পর বিরোধী অবস্থানে থাকে, তখন আমাদের নৈতিকতা সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রয়োজন হয়। আবার পরস্পর বিরোধী না হলেও নৈতিকতার প্রশ্ন উঠতে পারে। উদাহরন হিসাবে বলা যায় যে, সাধারন অবস্থায় মিথ্যা কথা বলা কি ঠিক? তার উত্তর হল না, কারণ তা সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য হিতকর নয়। কিন্তু কোনো ভাঙ্গা সম্পর্ককে জোড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে যদি মিথ্যা বলা হয় তাহলে তা যথার্থ বলে মানতে পারি। এই ক্ষেত্রে গান্ধীজী বলবেন, 'constructive lies' বা 'গঠনমূলক মিথ্যা' হল যথার্থ। যে মিথ্যার নির্মান ক্ষমতা আছে তা যথার্থ। দ্বান্দ্বিক নীতিগুলির কোনটি আমার কাছে গ্রাহ্য হবে, এবং কোন্ নীতিটিকে অমান্য করা যায় -- এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যে তত্ত্ব থেকে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকেই নীতিশাস্ত্র বলে।

নৈতিকতা হল দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। নৈতিকতা সম্পর্কে প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ – এই পর্যন্ত অনেক নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। উক্ত গবেষণা পত্রে আমার সুবিধার্থে নৈতিকতাকে মূলত তিনটি স্তরে ভাগ করেছি। প্রথম স্তরে, তথাকথিত নৈতিকতা (এযাবৎ কাল পর্যন্ত যে যে নৈতিক দর্শন সম্পর্কে অবগত হয়েছি, উক্ত গবেষণা পত্রে কেবল কান্টের নীতিতত্ত্ব আলোচ্য), দ্বিতীয় স্তরে, নারীবাদী নৈতিকতা (মূলত পরিস্থিতি সাপেক্ষ নৈতিকতা এবং দরদী নৈতিকতা), তৃতীয় বা অন্তিমস্তর, সিমন দ্য বোভায়ারের 'অনিশ্চিত' নৈতিকতা (Ambiguous Ethics)। স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, তিন ধরনের নৈতিকতা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয় আবার প্রত্যেকে যে একই মত

উপস্থাপন করেছে এমনও নয়। তিন ধরনের নৈতিকতা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, বলা যায় একে অপরের পরিমার্জিত রূপ। তবে একথা বোঝা যায় যে, সিমনের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা উক্ত দুটি মতের থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র।

৩.২) তথাকথিত নৈতিকতাঃ-> তথাকথিত নৈতিক তত্ত্বের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি নৈতিকতার তত্ত্ব হল মিলের উপযোগবাদ (Utilitarian Theory of Ethics) এবং জার্মান দার্শনিক কান্টের নীতিশাস্ত্র যা বিচারমূলক নীতিতত্ত্ব নামে (Right/ Justice Based Ethics) পরিচিত। এই নীতিতত্ত্বের মূল কথা হল, নীতিগুলি পূর্ব নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনশীল। নীতি নির্ধারকের মানদণ্ড গুলি হল : নীতিগুলি সর্বদা বুদ্ধি দ্বারা বিচার্য (Reason Guided), প্রেক্ষিত বিনির্ভর (Context-independent), নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal), নিরপেক্ষ (Impartial), লিঙ্গপ্রেক্ষিত বর্জিত (Gender-independent), বিমূর্ত (Abstract), সার্বিক (Universal)। যে কোনো পরিস্থিতিতে নীতিগুলি অপরিবর্তনীয়।

The traditional ethics is grounded in its commitment to apply universal moral prescription a priori to any and every situation. Consequently, in the ethics of justice, the moral agent, being dictated by abstract reasoning alone, takes impartial moral dicisions without actually judgeing the context in reality and ignoring the particularities of people concerned. This makes the justice ethics a-temporal and hence, it seems that morality is detached from the situation concerned.[1]

[1]. Mukherhjee. 2008. *Redefining Ethics as Care*. P. 138.

পরিস্থিতি নিরপেক্ষতার কথা এবং কোন্ কাজ করা উচিত এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি পুনরায় বলেছেন,

..... when Kant speaks of moral oughtness, he refers to the unconditional ought, for he thinks that morality must be necessary and universal and that it must be absolutely binding on everyone alike. Thus, for Kant, whoever the person is, whatever is his situation, he ought to do 'x'.[2]

কান্ট বলেছেন, এমন নীতি অনুসারে আমাদের কাজ করা উচিত যা পরবর্তী কালে নৈতিক বিধি (Ethical norm) হতে পারে, কেননা তা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার দ্বারা বিচার্য। পরিস্থিতি নিরপেক্ষ রূপেই নীতি গুলি কাজ করে।

While evaluating his notion of goodwill, Kant started, "I ought never to act except in such a way *that I can also will that my maxim should become a universal law.*" [3]

ধরাযাক, একজন ব্যক্তি 'ক' হিংসা বশত অপর একজন ব্যক্তি 'গ'-কে খুন করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই সে অপরাধী। অপর একজন ব্যক্তি 'খ' আত্মরক্ষার তাগিদে উত্যক্তকারী ব্যক্তি 'ঘ'-এর প্রতি হিংসা প্রয়োগের ফলে 'ঘ'-এর মৃত্যু হয়েছে। ফলত 'খ' নামক ব্যক্তিও অপরাধী। এবার প্রশ্ন হল যে, দুজন ব্যক্তি 'ক' এবং 'খ'-এর মধ্যে কার অপরাধ গুরুতর এবং দুজন ব্যক্তির কি একই সাজা প্রাপ্য? বিচারবাদী নীতিতাত্ত্বিকদের মতে, মানুষের জীবন নাশ করা যেকোনো

[2]Ibid, P.141.
[3] Ibid, P.141.

পরিস্থিতেতেই অন্যায় কাজ। উপরিউক্ত দুটি ঘটনায় 'ক' এবং 'খ' নামক ব্যক্তিদ্বয় যথাক্রমে 'গ' এবং 'ঘ' নামক ব্যক্তিদ্বয়কে খুন করেছে (পরিস্থিতি এই স্থলে বিচার্য নয়)। অতএব উভয়ে একই দোষে দোষী এবং উভয়ের একই সাজা প্রাপ্য। অর্থাৎ 'পরিস্থিতি' (Situation) এই স্থলে কোনো ভূমিকাই পালন করে না, তা কেবল ঘটনার পশ্চাৎপট (Background) হিসাবেই থেকে যায়। কান্ট পুনরায় বলেন,

.....a universal maxim is a moral law. Again, through moral duty's transcendence of human experience, Kant clearly sends the message that such moral ought-ness is shared by all rational beings, and if morality appears to exist universally and if we all conform to that universal maxim, then that morality exists a priori.[4]

কোনো ব্যক্তি বলতে পারেন যে তিনি কোনটা নৈতিক বা কোনটা অনৈতিক সেটা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার (reason) দ্বারা তিনি বুঝতে পারেন কিন্তু সেই অনুসারে কার্যসিদ্ধি করতে পারেন না। এক্ষেত্রে কান্টের বিখ্যাত উক্তি 'করা উচিত মনে করার অর্থ হল করতে পারি'। অর্থাৎ কান্ট যে ধরনের নীতি তত্ত্বের অবতারনা করেছিলেন তা এক প্রকার সারসত্তাবাদী নীতিতত্ত্ব। পূর্ব নির্ধারিত নৈতিক মূল্যবোধ থেকে অপরাপর নীতি গুলি সার্বিকভাবে নিঃসৃত হচ্ছে। অর্থাৎ কান্ট পূর্বনির্ধারিত একটি সারসত্তাকে (Essence) নৈতিকতার ভিত্তি রূপে স্বীকার করেন এবং অপরাপর

[4] Ibid, P.141.

নীতি গুলি সেই সারসত্তা থেকেই নিঃসৃত হয় বলে মনে করেছেন। তাই কান্ট প্রদত্ত নৈতিক তত্ত্বটিকে 'সারসত্তাবাদী' নৈতিক তত্ত্বও বলা যায়।

৩.৩) তথাকথিত নৈতিকতার নারীবাদী সমালোচনাঃ-> কান্টের নীতিতত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হয় তবে নারীবাদী দার্শনিকরা এই নীতি তত্ত্বকে সমালোচনা করে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নারীবাদী তত্ত্বের মূল আপত্তি বৈষম্যকে কেন্দ্র করে, তথাপি নারীবাদী তাত্ত্বিকদের নিজেদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে। তাই তারা 'FEMINISM' বলার তুলনায় 'FEMINISMS' বলাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

তথাকথিত নৈতিকতার সমালোচনার সূত্র ধরে নারীবাদী নৈতিকতার অবতারণা। নারীবাদী নৈতিকতার উল্লেখযোগ্য ভাগ হল দরদী নৈতিকতা, যা আমেরিকান নারীবাদী দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী ক্যারল গিলিগানের (born - 1936) ভাবনার দ্বারা সমৃদ্ধ। তথাকথিত নীতিতত্ত্বের বিপক্ষে গিলিগান তথা নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিকদের প্রধান আপত্তি হল : তথাকথিত নীতিবিদ্ সম্মত পূর্বনির্ধারিত নীতিগুলি কী সব ধরনের নৈতিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে? অন্য ভাষায়, ঐ নীতিগুলি কী পরিস্থিতি সাপেক্ষ নৈতিক দ্বন্দ্বের সাথে মোকাবিলা করতে সমর্থ?

তথাকথিত নৈতিকতায় পরিস্থিতি (Situation/ Context), যাপিত অভিজ্ঞতা (Lived Experience) ইত্যাদি উপেক্ষিত। সাবেকী নৈতিকতা যে দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতাকে দেখে তাকে নারীবাদী পরিভাষায় 'Gods Eye

View' বা 'Bird's Eye View' বলা হয়। এই দৃষ্টিকোণে আপাতদৃষ্টিতে সবাইকে সমান বলে মনে হলেও সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে একটা উচ্চনীচ ভেদ থেকেই যায়। তথাকথিত নৈতিকতায় নীতিগুলির যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি পরতঃপক্ষে পুরুষালী গুণাবলী বলে নারীবাদীরা মনে করেন। কেননা

Attempting to deal with the concern of women, it has been found that dynamics of relationships are central to lives of women, and they cast effects on their moral domain as well. These relationships seem to be governed more by emotion and co-feeling than by reason and universal rules.[5]

নারীবাদী তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, পরিস্থিতি নিরপেক্ষ ভাবে নৈতিকতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে নৈতিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়। নৈতিক কাজ পরিস্থিতি সাপেক্ষ। ধরাযাক, অসুস্থ স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য যদি এক ব্যক্তি চুরি করে তবে সেই কাজটি নৈতিক না অনৈতিক? আবার, মহাভারতের যুদ্ধ নৈতিক না অনৈতিক? তথাকথিত নীতিতত্ত্ব অনুসারে, দুটি কাজই অনৈতিক। কেননা চুরি করা অপরাধ এবং যুদ্ধ অর্থাৎ প্রাণনাশও অপরাধ। তাই দুটি কাজই অনৈতিক। কিন্তু নারীবাদী নৈতিকতা যেহেতু পরিস্থিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তাই উক্ত কাজ গুলিতে পরিস্থিতি বিচার্য। পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, উক্ত কাজ গুলি নৈতিক। অন্ততঃ সাধারন বুদ্ধি তাই বলে। কেননা প্রথম ঘটনাটির ক্ষেত্রে, চুরি করা অপরাধ, কিন্তু মানব জীবন বাঁচানোও

[5] Ibid, P.141.

নৈতিক কর্তব্য। তাই কোনো মানুষের প্রান রক্ষার জন্য যদি চুরি করা হয় তবে তা অনৈতিক কাজ নয়। আবার, যদি 'মহাভারতের যুদ্ধের' ঘটনাটি ধরা হয়, তবে সেই যুদ্ধ ছিল 'ধর্মযুদ্ধ'। অধর্মকে বিনাশ করে ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ঐ যুদ্ধ করা হয়েছিল। তাই নারীবাদী নীতি তত্ত্ব অনুসারে বলা যায় যে, উপরিউক্ত দুটি কাজই নৈতিক। অর্থাৎ একথা উপলব্ধ যে, যখন নৈতিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন দুটি নীতির মধ্যে তুলনা করে কোন্ নীতিটি বেশি গ্রহনযোগ্য তা বিচার করতে হয় এবং সেই বিচার অবশ্যই পরিস্থিতির সাপেক্ষে। তাই নারীবাদীদের সিদ্ধান্ত হল যে, বিমূর্ত, সার্বিক কোনো নীতি বা নৈতিক নিয়ম হওয়া সঙ্গত নয়, কেননা তা পরিস্থিতিকে বিচার করতে পারে না। নীতিগুলি অবশ্যই পরিস্থিতি সাপেক্ষ হবে। কোনো কিছু বিচার না করে, পরিস্থিতি সাপেক্ষতাকে না দেখে আমরা যদি অন্ধের মতো কিছু বুদ্ধি দ্বারা নির্ধারিত নীতিকে মেনে চলি তাহলে আমাদের যাপিত অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করা হয়। নারীবাদীরা মনে করেন যে, কোনো কাজকে নৈতিক বিবেচনার ক্ষেত্রে যাপিত অভিজ্ঞতার অবদান অনস্বীকার্য।

The priority of reason over emotion in resolving a moral conflict thus shifts the focus of traditional ethics from the significance of lived – experience of the individuals involved to the blind rational application of rule-based judgement to the situation.[6]

[6] Ibid, P.139.

নারীবাদী তাত্ত্বিকরা দেখান যে, তথাকথিত নৈতিকতায় নীতি গুলির বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা হয় যে, নীতি গুলি সার্বিক, প্রেক্ষিত বিনির্ভর, কিন্তু আদতে তা নয়, সেগুলির মধ্যে যে প্রেক্ষিত আছে তাকে তারা অস্বীকার করে।

Though the traditional ethicist claim that their principles are universal, transcendental and a priori, yet, on examination it is found that the principle have a historical past and a particular context.[7]

৩.৩) তথাকথিত নৈতিকতা এবং নারীবাদী নৈতিকতার পার্থক্যঃ-> তথাকথিত নৈতিকতা ও নারীবাদী নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য গুলি মূলত নিম্নরূপ ->

১) সনাতন নৈতিকতায় নিরপেক্ষতা (Impartial) হল একটি আবশ্যিক শর্ত। যে কোন কাজ নৈতিক/ অনৈতিক তা বিচার্য হবে নিরপেক্ষতার নিরিখে।

তুলনামূলক ভাবে নারীবাদী নৈতিকতায় প্রেক্ষিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ঠ্য। নৈতিক বা অনৈতিক দাবীর অন্তরালে পেক্ষিত অবশ্যক।

২) সনাতন নৈতিকতায় সর্বদায় একটি প্রামাণিকভঙ্গি ধারন করে। একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের নিরিখে সকল নৈতিকতাকে বিচার করা হয়।

অপরদিকে নারীবাদী নৈতিকতায় কখনোই প্রামাণিকতা দাবী করে না। তাদের বক্তব্য পুনর্বিচারের জন্য সবসময় প্রস্তুত।

৩) সনাতন নৈতিকতায় বুদ্ধি বিচার্য।

[7] Ibid, P.151.

নারীবাদী নৈতিকতায় বুদ্ধির পাশাপাশি আবেগের একটি মুখ্য ভূমিকা আছে।

৪) সনাতনপন্থীদের ঝোঁক সমরূপতার প্রতি। ফলে মনে করা হয় যে, একই ধরণের দৃষ্টান্তের বিচার একই হওয়া উচিত।

তুলনামূলকভাবে নারীবাদী নৈতিকতা সমরূপতাকে খোঁজার চেষ্টা না করে প্রতিটি সমস্যাকে প্রেক্ষিত অনুসারে বিচার করার ক্ষেত্রে আগ্রহী। প্রত্যেকটি কাজকে অনন্য মনে করা হয়।

৫) সনাতনপন্থীরা যে সত্তার কথা বলেন তা হল স্বাধীনসত্তা (Autonomous Self)। নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কর্তাকে নিরপেক্ষ হতে হবে।

তুলনামূলক ভাবে, নারীবাদী নৈতিকতায় স্বাধীন সত্তার তুলনায় সম্পর্কিত সত্তার (Relational self) উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। তারা মনে করেন যে, কোনো মানুষই অসম্পর্কিত নয়। কোনো মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব। কেননা তার লিঙ্গপ্রেক্ষিতকে সে কোনো ভাবেই উপেক্ষা করতে পারে না। তাই আপাত দৃষ্টিতে যাকে নিরপেক্ষ বলে মনে হয় তার অন্তরালেও এক ধরনের প্রেক্ষিত, সম্পর্ক থাকে। তাই তারা সম্পর্কিত সত্তার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে।

৬) স্বরচিত সীমাবদ্ধতার দরুন তথাকথিত নৈতিকতায় ধারণার পরিমণ্ডলটি একপেশে – এর মধ্যে নারীর অভিজ্ঞতার অনেকগুলি দিক স্থান করে নিতে পারে না। প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ

চাহিদার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের শ্রবণের দক্ষতা বাড়াতে হবে যাতে আমরা বিভিন্ন স্বর শুনে তাদের বক্তব্য বুঝতে পারি। এযাবৎ দর্শনের অঙ্গনে যাদের অপাংক্তেয় মনে করা হয়েছে তাদের কথা বুঝতে হবে।[৪]

৩.৪) দরদী নৈতিকতাঃ-> তথাকথিত নৈতিকতার সমালোচনা করে দরদী নৈতিকতার আত্মপ্রকাশ। আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী তথা নারীবাদী দার্শনিক ক্যারল গিলিগান (জন্ম- ১৯৩৬ সালে) এর প্রবক্তা।

In view of the feminist ethicists who virtually oppose the blind application of the rules to any and every situation, morality in its truest sense can be realized if the ethical decision reflects the agent's sensitivity and commitment to the five basic pillars of ethics:

a) Adhocism, b) Connectivity, c) Responsibility, d) Caring, e) Contextuality

In most of the recently developed ethical systems, which broadly have been named as alternative ethics is to suggest a possible alternative ethics, traces of these five pillars of ethics are incorporated in one way or the other. The aim of all these various types of alternative ethics is to suggest a possible alternative view to the long standing justice-based model which glorifies reason, principle, autonomy, and impartiality, leaving little space for true morality to cherish. Feminists are formulating this alternative ethics partly as a response to the failure of the traditional ethical system.[9]

---

[৪]. মৈত্র, ২০০৩, *নৈতিকতা ও নারীবাদ: দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা,* পৃ.২১২।

[9] Mukherhjee. 2008. *Redefining Ethics as Care*. P.145.

দরদী নৈতিকতার মূল বক্তব্য হল, পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থেকে কোনো কাজের নৈতিকতাকে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন যে, নৈতিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে ব্যক্তিকে অপরের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। ব্যক্তির সাথে অপরের সম্পর্ক কি তার উপর নৈতিকতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। তথাকথিত নৈতিকতায় যে অর্থে স্বাধীনতাকে ধরা হয়েছে, গিলিগান সেই অর্থে স্বাধীনতাকে ধরেন নি। সাবেকী দর্শনে স্বাধীনতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার সাথে যুক্ত। কিন্তু, গিলিগানের মতে, ব্যক্তি অপরের সাথে সম্পর্কিত থেকেও স্বাধীন থাকতে পারে। এই জন্যে তিনি Autonomous self বা স্বাধীন সত্তার পরিবর্তে সম্পর্কিত সত্তা বা Relational self এর কথা বলেছেন। তিনি আরোও বলেছেন, নারীর যে স্বর আমরা শুনতে পাই তা হল পিতৃতান্ত্রিক স্বর। এটি নারীর প্রকৃত স্বর নয়। পিতৃতান্ত্রিক স্বরে কথা বলে সে অভ্যাস বা ভয় বশত। পিতৃতন্ত্র তার আভ্যন্তরীণ স্বরকে চাপা দিয়ে রাখে। গিলিগান তার তত্ত্বে আভ্যন্তরীণ স্বরকে চেনা, তাকে প্রকাশ করা, তা ঠিকমত শোনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

৩.৫) সিমনের অনিশ্চিত নৈতিকতাঃ-> একথা অনস্বীকার্য যে, তথাকথিত নৈতিকতা এবং নারীবাদী নৈতিকতার সাথে সিমনের 'অনিশ্চিত' নৈতিকতার বৈসাদৃশ্য আছে। 'অনিশ্চিত নৈতিকতা' কি তা নিয়ে আলোচনা করার আগে কিছু সমস্যা উঠে আসে। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রশ্নটি সবার আগে ওঠে যে, 'নৈতিকতা' এবং 'অনিশ্চয়তা' কিভাবে সহাবস্থান করতে পারে? আর যদি অনিশ্চয়তাকে নৈতিকতার মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয় তবে 'নৈতিকতা' [সাধারনত নৈতিকতা বলতে

কোন কাজের যথার্থতা বিচারের মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয়] নির্ণীত হবে কিভাবে? বা আদৌও 'নৈতিকতত্ত্ব' বলে কোনো তত্ত্ব কি আমরা পাবো?

প্রথমত, সিমন যখন 'অনিশ্চয়তার' (Ambiguity) কথা বলেছেন, তখন অনিশ্চয়তাকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'অনিশ্চয়তা' বলতে 'উদ্ভট' বা 'অসম্ভব'-কে বোঝানো হয় না। সিমনের ভাষায় 'অনিশ্চয়তার' (Ambiguity) অর্থ হল:

The notion of ambiguity must not be confused with that of absurdity. To declare that existence is absurd is to deny that it can ever be given a meaning; to say that it is ambiguous is to assert that its meaning is never fixed, that it must be constantly won.[10]

অর্থাৎ অনিশ্চয়তার অর্থ হল যার (মানব অস্তিত্ব এবং নৈতিকতা) কোনো স্থায়ী অর্থ নেই এবং সেই অর্থ আমাদের চলার পথে গঠন করতে হবে।

অস্তিবাদী ভাবধারায় দীক্ষিত সিমন দ্য বোভায়ার পূর্বনির্ধারিত সবকিছুকে অস্বীকার করলেও মানব জন্ম এবং মৃত্যু – এই দুটি বিষয়কে 'নিশ্চিত' রূপেই স্বীকার করেছেন। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়কে তিনি 'অনিশ্চিত' বলে মনে করেন।

অন্যান্য অস্তিবাদী দার্শনিকদের মতো সিমনও মনে করেন যে, মানুষ জন্মাবধি স্বাধীন (একটি বিশেষ অর্থে স্বাধীন)। যে পরিস্থিতি এবং পরিবেশে

[10] Beauvoir. 1948. Translated by Frechtman. *The Ethics of Ambiguity*. P.129.

ব্যক্তির জন্ম হয় তাকে তিনি 'Facticity' বলেছেন। 'Facticity'-এই পর্যায়ে মানুষের কোনো পছন্দ থাকে না। এই পর্যায়ে তাকে একটি পরিস্থিতি ও পরিবেশকে মেনে নিতে হয় মাত্র। তবে একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, এই 'Facticity'-কে কোনো ভাবে অস্বীকার করা যায় না। তবে সিমন এর থেকে উত্তরনের (transcendence) কথা বলেছেন এবং উত্তরনের কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রকল্প গঠনের কথাও বলেছেন। একই সঙ্গে, সেই প্রকল্প সম্পর্কিত উদ্বেগ, সাফল্য ও অসাফল্যের বিষয়েও বলেছেন। সাফল্য অসাফল্যের কথা প্রসঙ্গে তিনি অপরের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন।

'অনিশ্চয়তা' বা 'Ambiguity' –এর অর্থ হল 'its meaning is never fixed, that it must be constantly won'। কিন্তু প্রশ্ন হল এই অনিশ্চয়তার সূত্রপাত কোথায়? জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী পর্যায় অনিশ্চিত কেন?

The Ethics of Ambiguity –এই বইয়ের শুরুর কথা হল:

"The continuous work of our life" says Montaigne, "is to build death."[11]

অর্থাৎ মানব জীবনের প্রতিনিয়ত কাজের অর্থ হল মৃত্যুকে গঠন করা এবং এর কিছু পরে তিনি আবার বলেছেন,

[11] Ibid, P.7.

Each one has the incomparable teste in his mouth of his own life, and yet each feels himself more insignificant than an insect within the immense collectivity whose limits are one with the earth's. [12]

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা অনন্য। তবুও সে বিশ্বব্রহ্মান্ডের মধ্যে নিজেকে কীটানুকীট মনে করে এবং একই সঙ্গে তার নিজের স্বাধীনতা, কাজ করার ক্ষমতা, নিজেকে গুরুত্ব দেওয়া অর্থাৎ প্রকল্প গঠন ইত্যাদির কথাও সে উপলব্ধি করে। জগতের নানা সত্য তার কাছে উদ্ভাসিত হতে থাকে। সিমনের ভাষায়,

..... at every moment, at every opportunity, the truth comes to light, the truth of life and death, of my solitude and my bond with the world, of my freedom and my servitude, of the insignificance and the sovereign importance of each man and all men..... Since we do not succeed in fleeing it, let us therefore try to look the truth in the face.[13]

প্রত্যেকের নিজের মতো জন্ম ও মৃত্যুর সত্য, তার একাকীত্ব, জগতের সাথে তার সম্পর্ককে, তার স্বাধীনতাকে বুঝতে হয়। সে তার ক্ষুদ্রতা, অর্থহীনটাকে বুঝতে পারে – যেহেতু এই চরম সত্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। এর মুখোমুখি দাঁড়ানোই কর্তব্য। এই দ্বিকোটিক দোলাচলের মধ্যে শুরু

[12] Ibid, P.9.
[13] Ibid, P.9.

হয় মানব জীবনের **'Fundamental ambiguity'** অর্থাৎ তার মনে হতে থাকে যে তার জীবন 'অনিশ্চিত'।

অনিশ্চয়তাকে ভিত্তি করে [যেহেতু মানব জীবন উদ্ভট বা অসম্ভব (absurd) নয়] শুরু হয় মানব জীবনের যাত্রা। অর্থাৎ কোনো পূর্বপরিকল্পিত নীতি বা তত্ত্বকে অস্বীকার করেই শুরু হয় এই যাত্রা। অস্তিবাদী দার্শনিকদের মতে, মানুষের সব নৈতিক মূল্যের মূলে রয়েছে স্বাধীনতা। কান্ট মানব স্বাধীনতার কথা বললেও অধিবিদ্যক স্তরে গিয়ে মানুষ বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারাই পরিচালিত হয় বলে তিনি মনে করতেন। ফলে কান্টের কাছে 'অনিশ্চয়তা'র কোনো স্থান নেই। কেননা তিনি 'অধিবিদ্যক স্তরে বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়াকে' মানুষের সাধারন বৈশিষ্ঠ্য বলে মনে করতেন। একই সঙ্গে অবস্থান (situation/context) তাঁর দর্শনে পশ্চাৎপট হিসাবেই স্থান পায়। অপরদিকে সিমন মনে করেন যে, প্রত্যেকটি মানুষ স্বাধীন – এটি ছাড়া মানুষের আর কোন সাধারন বৈশিষ্ঠ্য বা ধর্ম নেই। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে তিনি চরম বিষয়িতার (Absolute Subjectivity) কথা বলছেন, কিন্তু আদতে তা নয়। প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা, প্রত্যেকে স্বাধীন একথা স্বীকার করেও তাদের মধ্যে এক ধরনের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন, এমনকি তিনি এমন বিধি তৈরীর কথা বলেন যা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। সিমনের ভাষায়,

An ethics of ambiguity is one which will refuse to deny a *priori* that separate existence can, at the same time, be bound to each other, that their individual freedoms can forge laws valid for all.[14]

ব্যক্তির স্বাধীনতা বা ব্যক্তির নির্বাচিত প্রকল্পের সাথে অপরকে কিভাবে সংঘবদ্ধ করা যায় এই নিয়ে একধরনের দোলাচল চলতে থাকে – সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্যে। ব্যক্তির প্রকল্পে যদি অন্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটে এবং অপরের দ্বারা যদি ব্যক্তির প্রকল্প গৃহীত হয় তবে তা সফল প্রকল্প কিন্তু যদি তা না হয় তবে তা হল ব্যর্থতা। সিমন মনে করেন নৈতিক তত্ত্বের সূত্রপাত ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে। যদি জীবনে ব্যর্থতা না থাকত তবে নৈতিক তত্ত্ব তৈরি হত না। সিমনের ভাষায়,

.....the most optimistic ethics have all begun by emphasizing the element of failure involve in the condition of the man; without failure, no ethics;[15]

তিনি পুনরায় বলছেন, ব্যর্থতাকে বাদ দিয়ে যদি নীতিতত্ত্ব স্থাপন করা হয় তবে সেই নৈতিক তত্ত্ব কেবল ঈশ্বরের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে, মানুষের জন্য নয়। কেননা মানব জীবনে সফলতা এবং ব্যর্থতা উভয়ই থাকে। সিমনের ভাষায়,

.....from a very start, would be an exact co-incidence with himself, in a perfect plenitude, the notion of having-to-be would have no meaning. One does not offer an ethics to God.[16]

[14] Ibid, P.18.
[15] Ibid, P.10.
[16] Ibid, P.10.

এর দ্বারা একই সঙ্গে মানব জীবনের ব্যর্থতাকে তিনি স্বীকৃতি দিলেন, ব্যর্থতার দ্বারাই নৈতিক তত্ত্বের সূত্রপাত, তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সিমন যখন ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলেন তার প্রকৃত অর্থ হল যে,

মানুষের স্বাধীন হওয়াটা জন্মগত অবস্থা নয়। তেমন হলে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক ধরনের ন্যাচারালিজম বা স্বাভাবিক বাস্তববাদ স্বীকার করতে হত। মানুষ স্বাধীন হতে পারে। স্বাধীনতার সম্ভবনার মুখোমুখি দাঁড়ালে উৎকণ্ঠা হয়। স্বাধীন হওয়া একটা অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব বলে মনে হয়। ফলে দায়িত্ব এড়ানোর জন্য মানুষ অসংলগ্নভাবে এক 'অ্যাটিটিউড' থেকে আর এক 'অ্যাটিটিউড' বা এক মনোভাব থেকে আর এক মনোভাবে চলে যায়। এই সরে যাওয়াটাকে সিমন স্বাধীনতা বলবেন না। স্বাধীন হওয়ার অর্থ পরিকল্পিতভাবে কিছু করা।[17]

অর্থাৎ তিনি যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তেমনই ব্যক্তি স্বাধীনতার একটি সীমানাও নির্দেশ করলেন। এও যেন এক প্রকার 'অনিশ্চয়তা'-কেই পুনরায় প্রতিষ্ঠা করলেন।

সিমন দ্য বোভায়ার আমাদের জানাচ্ছেন যে, দেকার্ত বলছিলেন যে মানুষের প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হল মানুষ সর্বদা নিজেকে শিশু হিসাবে রাখতেই পছন্দ করেন। শৈশবে ব্যক্তির একটি নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হয় কিন্তু ব্যক্তি নিজের সেই নির্ভরশীলতাকে কোনো ভাবে অতিক্রম করতে চায় না। একথা অনস্বীকার্য যে, শিশু যে পরিবেশে জন্মগ্রহন করে সেখানে সব কিছুই 'স্থিরীকৃত' বা পূর্ব নির্ধারিত, সিমন যাকে 'Ready-made Things' বলেছেন। পরিবেশের

[17] মৈত্র, ২০১৩, *উজানি মেয়ে: সিমন দ্য বোভায়ার-এর জীবন ও দর্শন*, পৃ.১৩৪।

সবকিছুই যেন অপরিবর্তনীয় এবং পূর্বপরিকল্পিত। সিমন তাই জগতকে 'Serious World' বলেছেন। সিমনের ভাষায়,

He can do with impunity whatever he likes. He knows that nothing can ever happen through him; everything is already given; he acts engage nothing, not even himself.[18]

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে ব্যক্তি যে পরিবেশে জন্মগ্রহন করে সেখানে প্রচলিত শব্দ, রীতি, মূল্যবোধ এমনকি অধিকাংশ সম্পর্কও পূর্ব নির্ধারিত। সে তার স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করতে পারে না, কারণ সে জানে যে তার কোনো কাজ পরিস্থিতিকে পাল্টাবে না। ফলত ব্যক্তি হল নিষ্ক্রিয়। তাই পরিবেশ নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির উপর পূর্ব নির্ধারিত মুল্যবোধ চাপিয়ে দেয়। সিমনকে অনুসরণ করে বলা যায়,

We think that the meaning of situation does not impose itself on the consciousness of a passive subject,[19]

সিমন মনে করেন যে, ব্যক্তিকে স্বাধীন বিষয়ী (Free subject/ Agent) হয়ে উঠতে হবে তার প্রকল্প নির্বাচনের মাধ্যমে। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থানের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। তবে সেই অবস্থান সবার ক্ষেত্রে যে সমান হবে এমন নয়। এই কারনে তিনি মনে করেন যে, একই ঘটনা বিভিন্ন

[18] Beauvoir. 1948. Translated by Frechtman. *The Ethics of Ambiguity*. P.37.
[19] Ibid, P.20.

ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। বিষয়ীতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে,

Subjectivity is re-absorbed into objectivity of the given world. Revolt, need, hope, rejection, and desire are only the resultants of external forces.[20]

অর্থাৎ বিষয়ীতা (Subjectivity) পরিস্থিতির (Situation) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে সেটি আর বিষয়ীতা থাকে না, বিষয়ীতা অনেক সময়ই বিষয়তে পরিনত হয়ে যায়।

সিমন মনে করেন যে, পরিস্থিতি এবং সম্পর্ককে বাদ দিয়ে আদৌ বিষয়ীতা গঠন করা যায় কি না সেই বিষয়টি এখন প্রশ্নাতীত। একটি ব্যক্তি সবসময় 'Serious World'-এ জন্ম গ্রহন করে, সেখানে সে নিক্ষিপ্ত হয়। এই বিষয়ে তিনি তাঁর মতের কোন পরিবর্তন করেন নি।

পূর্বেই উল্লিখিত যে, সিমন আমাদের জানাচ্ছেন যে, দেকার্ত মানব জীবনের প্রধান সমস্যা হিসাবে 'নির্ভরশীলতাকে' উল্লেখ করেছেন। সিমন শৈশবে ব্যক্তির নির্ভরশীলতাকে অস্বীকার করছেন না। এই প্রসঙ্গেই তিনি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

It is then that we discover the difference which distinguishes them from an actual child: the child's situation is imposed upon him whereas the

[20] Ibid, P.19-20.

woman (I mean the western woman of today) chooses it or at least consents to it.[21]

অর্থাৎ,

শিশুর অবস্থান ও 'প্রাপ্তবয়স্ক শিশুর' অবস্থানের পার্থক্য এই যে, শিশুকে সিরিয়াস জগতে নিক্ষেপ করা হয় কিন্তু 'প্রাপ্তবয়স্ক শিশু' সিরিয়াস জগতে থাকাটা হয় নির্বাচন করে বা সে থাকতে সম্মত হয়।[22]

এর সাথে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় অবস্থিত মেয়েদের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য যে, মেয়েরা, সিমন যাকে 'Serious World' বলেছেন, সেই জগতে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এর কারণ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, প্রথমত, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো তাদেরকে যে ভাবধারায় গঠন করে এটি তার ফল। এর দ্বিতীয় কারণ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মেয়েদের স্বাধীনতার মুখোমুখি দাঁড়ালে উৎকণ্ঠা হয়। মেয়েরা সম্পর্কিত থাকতে পছন্দ করে। ফলে কিভাবে সম্পর্কিত থেকে স্বাধীনতাকে প্রকাশ করা যায়, একটি স্বাধীন মানুষ হিসাবে কাজ করা যায় তা তারা বুঝতে পারে না। তাই নিজের পছন্দ মতো জগত তৈরি করার থেকে 'Serious World' –এ মানিয়ে নেওয়া অনেক সহজ বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তিনি তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে লিখছেন যে, মুক্ত-পুরুষ, ক্রীতদাস, পুরুষ ও মহিলা, প্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশু সকলেরই মনের (soul) বিভিন্ন অংশ আছে, তাদের যৌক্তিক নিয়ামক অংশ আছে এবং

[21] Ibid, P.38.

[22] মৈত্র, ২০১৩, *উজানি মেয়ে: সিমন দ্য বোভায়ার-এর জীবন ও দর্শন*, পৃ.১৩৫।

তাদের অযৌক্তিক নিয়ামক অংশও আছে; কিন্তু বিভিন্ন জনের মধ্যে তা বিভিন্ন ভাবে আছে। যেমন দাস-এর বিচার ক্ষমতা নেই, মেয়েদের বিচার-ক্ষমতা থাকলেও তার কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং যে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। আর শিশুদের বিচার ক্ষমতা অত্যন্ত অপরিনত অবস্থায় থাকে।[23]

অ্যারিস্টটল বা অন্যান্য তথাকথিত দার্শনিকরা মনে করেন যে, মেয়েদের কোনো নিজস্ব স্বাধীনতা নেই। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রসঙ্গে মনুর কথাও বলা যায়। তিনি মনে করতেন যে, মেয়েদের কোনো অবস্থায় স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। তিনি বলতেন যে, 'শৈশবে মেয়েদের বাবার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বৃদ্ধ বয়েসে পুত্রের অধীনে থাকা আবশ্যক'। অন্যথায় মেয়েরা বিপথে যেতে পারে বলেও তিনি মনে করতেন।

সিমনের দর্শনেও এই প্রসঙ্গে 'পরিস্থিতি'-কে একটি উল্লেখযোগ্য মানদণ্ড হিসাবে গ্রহন করা হয়েছে। তিনি মনে করেন যে, কোনো ব্যক্তি আদতে স্বাধীন নাকি তার স্বাধীনতার প্রতীতি হয় সেটা আগে নির্ধারণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গেই তিনি মুসলিম হারেমে অবস্থিত মেয়েদের কথা উল্লেখ করেন। আমরা মনে করি যে, মুসলিম হারেমে অবস্থিত মেয়েরা অবদমিত, তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই, কিন্তু হারেমের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কি তা বাইরে থেকে বিচার করা সম্ভব নয়। হয়তো তারা এক ভাবে স্বাধীন। তবে সেই স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, বরং তা স্বাধীনতার ভান মাত্র। তবে সিমন এই বিষয়েও বলেন যে,

[23] মৈত্র, ২০০৩, *নৈতিকতা ও নারীবাদ: দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা,* পৃ.১১।

যদি হারেমে অবস্থিত মেয়েদের স্বাধীনতা প্রয়োগের সময় আসে এবং সে সময় যদি তারা স্বাধীনতা প্রয়োগ না করে তবে তা ভুল করা হবে। সিমনের ভাষায়,

.....the Mohammedan woman enclosed in a harem have no instrument, be it in thought or by astonishment or anger, which permits them to attack the civilization which oppressed them. Their behavior is defined and can be judged only within given situation, and it is possible that in this situation, limited like every human situation, they realized a perfect assertion of their freedom. But once there appears a possibility of liberation, it is resignation of freedom not to exploit the possibility, a resignation which implies dishonesty and which is a positive fault.[24]

প্রশ্ন হতে পারে, সিমন তাঁর *The Ethics of Ambiguity*-কে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পরিস্থিতির কথা বহুবার বলেছেন। এবং একই সঙ্গে তিনি এটিও বলেন যে, পূর্বনির্ধারিত নীতিসমূহ নৈতিক তত্ত্ব নির্মাণে ব্যর্থ। তবে সিমনের প্রস্তাবিত নৈতিক তত্ত্বকে 'পরিস্থিতি সাপেক্ষ নৈতিকতা' (situational ethics) বলতে অসুবিধা কোথায়? বলা বাহুল্য যে, পরিস্থিতি সাপেক্ষ নৈতিকতার সমর্থক নারীবাদী নীতি তাত্ত্বিকরাও। তবে সিমনের দর্শনের স্বাতন্ত্র্যতা কোথায়?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, *The Ethics of Ambiguity* এবং পরিস্থিতি সাপেক্ষ নৈতিকতার একই। কিন্তু আদতে না। পরিস্থিতি সাপেক্ষ নৈতিকতায় পরিস্থিতিটিই প্রধান ভুমিকা পালন করে। পরিস্থিতিগুলির উপর নির্ভর

[24] Beauvoir.1948. Translated by Frechtman. *The Ethics of Ambiguity*. P.38.

করে নৈতিক নীতি সমূহ নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ কে নৈতিক কর্তা (Ehtical Agent) এবং কাকে নিয়ে নৈতিক তত্ত্ব দেওয়া হচ্ছে – তা স্পষ্ট। যেমন যদি তৃতীয় বিশ্বের মহিলাদের নিয়ে নৈতিক তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয় তবে যে প্রস্তাব করছে সেই ব্যক্তি হল নৈতিক কর্তা, এবং তৃতীয় বিশ্বের মহিলারা হলেন নৈতিক তত্ত্বের অন্তর্গত। এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার কোনো অবকাশ নেই। নীতি গুলির প্রয়োগ সম্পর্কে এই ধরনের নৈতিকতায় একটা খোলা মুখের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু নীতি গুলি সম্পর্কে নয়। যেমন – যদি কোনো পরিস্থিতিতে মিথ্যা কথা বলা উচিত বলে মনে হয় তবে সেই পরিস্থিতির নিরিখে 'মিথ্যা কথা বলা' নৈতিক কাজ হবে। সুতরাং পরিস্থিতি সাপেক্ষ নৈতিকতায়ও একটা দ্বিকোটিক বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। সেখানে ঠিক ভুলের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজন আছে। অপরদিকে সিমন দ্য বোভায়ারের দর্শনে অনিশ্চয়তার সূত্রপাত হয় যখন ব্যক্তি একই সঙ্গে নিজেকে গুরুত্ব দেয় এবং এই বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে নিজেকে কীটানুকীট মনে করে। তাই সিমনের দর্শনে নৈতিকতা এবং যার উপর নৈতিকতা আরোপ করা হচ্ছে তার কোনো স্পষ্ট বিভাজন পাওয়া যায় না। অপর কারণটি হল, সিমন 'আমার প্রকল্প' বলার তুলনায় 'আমাদের প্রকল্প' বলাতে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। ফলত, 'আমাদের প্রকল্পে' কে 'কর্তা' (Agent) এবং কে 'অপর' (Other) তার কোনো স্পষ্ট বিভাজন পাওয়া যায় না। কর্তা এবং অপর একে অপরের সাথে সম্মিলিত অবস্থায় থাকে। তাই সিমনের দর্শন অনুসারে, নৈতিক কর্তা এবং অপরকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। অস্তিবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী সিমন নৈতিক তত্ত্বকে উপস্থাপন করতে গিয়ে 'অনিশ্চয়তা' ছাড়া

দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিল না। এমন নয় যে, ব্যক্তি ও অনিশ্চয়তা দুটি আলাদা অবস্থান করে। ব্যক্তির অস্তিত্বের মধ্যেই অনিশ্চয়তা অবস্থান করে। তাই ব্যক্তি কৃত যে কোন কাজও অনিশ্চিত হবে।

ব্যক্তির কৃত কাজের মধ্যে প্যাশনের বিশেষ গুরুত্বের আছে বলে তিনি মনে করতেন। অধ্যাপিকা শেফালী মৈত্রকে অনুসরণ করে বলা যায়,

প্রতিটি মানুষ পৃথিবীতে এসে জগৎকে একটা নতুন মানে দেয়। মানুষের জীবনীশক্তি, সংবেদনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তা কোনোটাই পূর্বপ্রদত্ত নয়; এগুলি জগতের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার এক একটি উপায়। ব্যক্তি কী ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করবে তার সাথে তার শারীরিক যোগ আছে। শরীর একটা 'ব্রুট ফ্যাক্ট' বা বস্তু নয়। শরীরের মাধ্যমে আমরা জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি। জীবনীশক্তির সাথে ঐচ্ছিক উদাহৃতার যোগ রয়েছে। সংবেদনশীল হওয়ার অর্থ হল জগতের প্রতি ও নিজের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। এই স্বতঃস্ফূর্ত গুণগুলি যেমন জীবনীশক্তি, সংবেদনশীলতা ইত্যাদি হল জগতের অর্থের জনক, এগুলির মাধ্যমে আমরা জীবনের লক্ষ্য স্থির করি; বেঁচে থাকার মানে এবং আনন্দ খুঁজে পাই। এই স্বতঃস্ফূর্ত গুনগুলিকে সিমন প্যাশন বলেছেন। প্যাশন-এর উপস্থিতির ফলে জীবনের উষ্ণতা উপলব্ধি করা যায়।[25]

পূর্বেই উল্লখ করা হয়েছে যে, সিমন অস্তিবাদী ভাবধারাকে অনুসরণ করে তাঁর দার্শনিক ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাই তাঁর মতে, পূর্বনির্ধারিত কোনো কিছুই নেই, মানুষ শূন্য সত্তা থেক তার যাত্রা শুরু করে। ব্যক্তির পরিস্থিতি, ইচ্ছা, সংবেদনশীলতা, জীবনীশক্তি ইত্যাদিকে অনুসরণ করে ব্যক্তি জগতের অর্থ নিরূপণ করে। প্রশ্ন হল, সকল ব্যক্তি কি এই কাঠামো অনুসরণ করে? অন্য ভাষায়

[25] মৈত্র, ২০১৩, *উজানি মেয়ে: সিমন দ্য বোভায়ার-এর জীবন ও দর্শন*, পৃ.১৩৫-১৩৬।

সবাই কি নিজের স্বাধীনতাকে স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারে এবং জাহির করতে পারে? যেহেতু মানুষ বিচিত্র স্বভাবের হয়ে থাকে, সেই কথা অনুসারে সিমন বিভিন্ন ধরনের মানুষের কথা বলেছেন এবং সেই অনুসারে তাদের নৈতিকতারও কথা বলেছেন।

যদি কোনো ব্যক্তি তাঁর স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে, নিজের পছন্দকে বিসর্জন দিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির মতো করে নিজের জীবন অতিবাহিত করে তবে তাকে অবমানুষ বা সাব-ম্যান বলা হয়। তাদের সমস্যা হল স্বাধীনতার মুখোমুখি দাঁড়ালে তাদের উৎকণ্ঠা হয়। তাই তারা সবসময় কোনো নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে, যে আশ্রয়কে অবলম্বন করে সে তাঁর নৈতিক কর্ম নির্ধারণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'নিরাপদ আশ্রয়' বলতে এখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তির অধীন বা কোন বিশেষ তন্ত্রের অধীনতার কথা বলা হয়েছে। সিমন সেই ব্যক্তি বা তন্ত্রকে 'Serious man' বলছেন। 'অবমানুষ' হল সেই সিরিয়াস ম্যান-এর পদাঙ্ক অনুসারী। অবমানুষ বা সাব-ম্যান –এর বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

The fact is that no man is datum which is passively suffered; the rejection of existence is still another way of existing; nobody can know the peace of the tomb while he is alive. There we have the defeat of the sub-man..... He is afraid of engaging himself in a project as he is afraid of being disengaged and thereby of being in a state of danger before the future, in the midst of his possibilities. He is thereby led to take refuge in the ready-

made values of the serious world. He will proclaim opinions; he will take shelter behind a label;[26]

তিনি অবমানুষ সম্পর্কে পুনরায় বলেছেন,

The attitude of the sub-man passes logically over into that of the serious man; he forces himself to submerge his freedom in the content which the latter accepted from society.[27]

সিমন যেহেতু অনিশ্চয়তার কথা বারংবার বলেছেন তাই মনে হতে পারে যে তিনি শুন্যতাবাদের কথা বলেছেন। *The Ethics of Ambiguity* বইয়ে তিনি আম্বিগুয়িটির সাথে শুন্যতাবাদের পার্থক্যের কথাও বলছেন। সমাজবদ্ধ কিছু মানুষের অবস্থান যে শুন্যতাবাদের দিকে ঘেঁষা সেই কথাও তিনি বলেছেন। আম্বিগুয়িটির সাথে শুন্যতাবাদের পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, শুন্যতাবাদে এক প্রকার নঞর্থক ভাবনা প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এই মতবাদে শুধু খারিজ দেখা যায়। কোনো সদর্থক দিক খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরদিকে 'আম্বিগুয়িটি' বলতে কেবলমাত্র স্থায়ী কোন অর্থকে খারিজ করা হয়েছে মাত্র, বলা হয়েছে যে, কোনো বিষয়ের অর্থ প্রতিনিয়ত অর্জন করতে হয়। শুন্যতাবাদ বা Nihilism বলতে গিয়ে সিমন বলেছেন,

The attitude of the nihilist can perpetuate itself as such only it reveals itself as a positivity at its very core. Rejecting his own existence, the nihilist

[26] Beauvoir. 1948. Translated by Frechtman. *The Ethics of Ambiguity.* P.43-44.
[27] Ibid, P.45.

must also rejected the existence which confirm it. If he wills himself to be nothing, all mankind, must also be annihilated; otherwise, by means of the presence of this world that the Other revels he meets himself as a presence in the world. But these thirst for destruction immediately takes the form of a desire of power. The teste of nothingness joins the original taste of being whereby every man is first defined; he realizes himself as a being by making himself that by which nothingness comes into the world.[28]

শুন্যতাবাদ সম্পর্কে এবং তার সমস্যা কী তার সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

The nihilist attitude manifested a certain truth. In this attitude one experiences the ambiguity of human condition. But the mistake is that it defines man not as the positive existence of a lack, but as a lack at the heart of existence; ..... The fundamental fault of the nihilist is that challenging all the given values, he does not find beyond their ruin, the importance of that universal, absolute end which freedom itself is.[29]

সুতরাং একথা বলা যায় যে, শুন্যতাবাদ বা নিহিলিজম –এই মতের সমর্থকরা আদৌ কোনো নৈতিকতত্ত্ব দেবেন কি না সেই বিষয়ে সংশয় আছে। শুন্যতাবাদ নৈতিক দায়িত্বকে একভাবে অস্বীকার করে। ফলত এর বিকল্প আমরা আশা করতে পারি।

[28] Ibid, P.55-56.
[29] Ibid, P. 57-58.

শুন্যতাবাদের বিকল্প হিসাবে সিমন হঠকারী ব্যক্তির (adventurer) কথা উল্লেখ করেছেন। এই জাতীয় মতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের একটি সদর্থক দিক আছে। তারা তাদের কাজকে (action) বিশেষ গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ সে তাঁর কাজের মাধ্যমে নিজের স্বাধীনতার প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু তাদের কাছে 'স্বাধীনতার' অর্থ হল 'চূড়ান্ত স্বাধীনতা' (Absolute Freedom)। তারা নিজেদের স্বাধীনতা প্রকাশ করতে গিয়ে অন্য ব্যক্তি কিভাবে তার প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবে – সেই বিষয়ে তারা অবগত নয়। তাদের মধ্যে চরম বিষয়িতার (Absolute Subjectivity) বহিঃপ্রকাশ হয়। এই মতের সমর্থকরা মনে করেন যে, অপরে হল তার প্রকল্পের পরিপন্থী। তাই সে অপরের স্বাধীনতাকে নাকচ করার চেষ্টা করে। সিমনের ভাষায়,

The man we call an adventurer, on the contrary, is one who remains indifferent to the content, that is, to the human meaning of his action, who thinks he can assert his own existence without taking into account that of others.[30]

সিমন পুনরায় হঠকারী ব্যক্তি বা adventurer man সম্পর্কে বলেন যে,

Thus, the adventurer devises a sort of moral behavior because he assumes his subjectivity positively. But if he dishonestly refuses to recognize that this subjectivity necessarily transcends itself toward others, he will enclose himself in a false independence which will indeed be servitude. To the free

[30] Ibid, P.61.

man he will be only a chance ally in whom one can have confidence; he will easily become an enemy. His fault is believing that one can do something for oneself without others and even against them.[31]

স্বাভাবিকভাবেই হঠকারী ব্যক্তির মতো মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারাও নৈতিকতা সম্ভবপর হবে না। তাদের প্রকল্পে অপর ব্যক্তি কিভাবে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করবে সেই বিষয়ে একটি সমস্যা থেকেই যায়।

অপর বিকল্পের সন্ধান দিতে গিয়ে সিমন আবেগমথিত সত্তা বা Passionate Man-এর কথা বলেছেন। তারা হঠকারী ব্যক্তির মতো নয়, তাদের প্রকল্পে অপরের স্থান আছে, এবং তারা নিজেদের স্বাধীনতা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। তবে তাদের সমস্যা হল তারা তাদের প্যাশন বা আবেগকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়। ফলত যে সমস্যা হয়, তারা নিজের আবগকে মূল্য দিতে গিয়ে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তারা অপরকে নীচু প্রতিপন্ন করে। সিমন মনে করেন যে, সেই প্যাশন কাঙ্ক্ষিত নয় যা নিজের স্বাধীনতাকে জাহির করতে গিয়ে অপরের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। সিমন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বা নৈতিক স্তরে প্যাশনকে একটি আলাদা গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, প্যাশন ছাড়া মানব জীবন অপূর্ণ, এটি ছাড়া কোনো প্রকল্প গ্রহন সম্ভব হবে না। কিন্তু সেই প্যাশন কাম্য নয় যা অপরকে বস্তু হিসাবে মনে করে তাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং প্যাশনের ধ্বংসাত্মক দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,

[31] Ibid, P.63.

ব্যক্তি যখন প্যাশন বা আবেগের দ্বারা চালিত হয় তখন তার কাছে সেই আবেগটিই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পায় এবং সে তখন ঐ আবেগের দ্বারা এতটাই চালিত হয় যে, সেই আবেগটি অতিরিক্ত তার কাছে কিছুই গ্রাহ্য হয় না এবং যে বস্তুকে ঘিরে সেই আবেগ, সেই বস্তুটিকে না পাওয়া অবধি সে কোনো কিছুতে মনোনিবেশ করতে পারে না। ফলত সেই আবেগের উপর ভর করে সে ভুল কাজও করতে পারে, এমনকি ধ্বংসাত্মক কাজও করতে পারে। তাই সিমন এই জাতীয় আবেগের উপর ভর করে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বলছেন । সিমনের ভাষায়,

The passionate man is, in a way, the antithesis of the adventurer. In him too there is a sketch of synthesis of freedom and its content. But in adventure it is the content which does not succeed in being genuinely fulfilled. Whereas in the passionate man it is subjectively which fails to fulfill itself genuinely.....the passionate man is that he sets up the object as an absolute, not, like the serious man, as a thing detached from himself, but as a thing disclosed by his subjectivity.[32]

যেহেতু আবেগমথিত সত্তার আধিকারী ব্যক্তিরা সর্বদা নিজের আবেগ দ্বারা চালিত হয় এবং কখনো কখনো আবেগের ধ্বংসাত্মক দিকটি সমাজের সামনে উন্মুক্ত হয়। সে তার ইচ্ছা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। তাই সিমন বলছেন যে, এই জাতীয় মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব নৈতিকতার ক্ষেত্রে উপযুক্ত হতে পারে না। সিমনের ভাষায়,

[32] Ibid, P.63-64.

Any conversation, any relationship with the passionate man is impossible..... The passionate man is not only an inert facticity. He too is on the way to tyranny. He nevertheless attempt to impose it upon others. He authorizes himself to do that by a partial nihilism.[33]

অর্থাৎ আবেগ মথিত সত্তার পক্ষে নৈতিক দায়িত্ব সামলানো যথেষ্ট কঠিন।

তাহলে যে প্রশ্ন ওঠে নৈতিকতা কিভাবে সম্ভব? সমাজে যে এই জাতীয় ব্যক্তি আছে সেই কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু উপরিউক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে নৈতিকতাকে স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, সমাজে এই সমস্ত মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাও অবস্থান করে। ফলত, আমরা বলতে পারি যে নৈতিক অবস্থান হল 'অনিশ্চিত'। কারন উপরিউক্ত ব্যক্তিদের যেমন কোনো ভাবে অস্বীকার করা সম্ভব নয় তেমনই তাদের কোনো একজনের মতকে অনুসরণ করে নৈতিকতাকে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না। ফলত যে সিদ্ধান্তে আসতে পারি তা হল 'নৈতিকতা অনিশ্চিত'।

'নৈতিকতা অনিশ্চিত' হলে প্রথমে যে প্রশ্নটি ওঠে, কিভাবে নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারিত হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের 'অনিশ্চিত' শব্দটির দুটি দিকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা আবশ্যক। যদিও অনিশ্চয়তার নঞর্থক দিকের প্রতি সাধারন ভাবে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভবনা বেশী। কেননা কিভাবে নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারিত হবে? নৈতিকতার সাথে অনিশ্চয়তা থাকলে অপর ব্যক্তি কীভাবে

[33] Ibid, P.65.

নৈতিকতায় অংশগ্রহণ করবে সেই প্রশ্নটিও ওঠে। যদিও সিমন অনিশ্চয়তার নঞর্থক দিক নিয়ে চিন্তিত নয়। তার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, তিনি যেহেতু অস্তিবাদী কাঠামোকে অবলম্বন করে নৈতিকতাকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন, তাই তার কাছে 'অনিশ্চয়তা' ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিকল্প পথ ছিল না। আর সর্বোপরি তিনি অনিশ্চয়তার সদর্থক দিক নিয়ে বেশী ওয়াকিবহাল।

প্রত্যেক মানুষ তার স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রকল্প গ্রহন করে। প্রকল্পটি সেই ব্যক্তির অবস্থান, পছন্দ ইত্যাদি অনুসারে হবে।

সিমন বলছেন নির্বাচন একটা করতেই হবে। নির্বাচন সর্বদা বর্তমানের নিরিখে করতে হয়। ভবিষ্যতের খোলামুখ সবসময় থাকবে, থাকবে বিভিন্নতা।[34]

এটিই হল অনিশ্চয়তার সদর্থক দিক। সিমনের ভাষায়,

...the constructive activities of man take on a valid meaning only when they are assumed as a movement towards freedom;[35]

সিমন বারংবার স্বাধীনতার কথা বলেন এবং বলেন যে স্বাধীনতার মাধ্যমে নৈতিকতাকে অর্জন করা যায়। তবে তাঁর কাছে স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করা নয়। তাঁর দর্শন অনুসারে নৈতিকতার লক্ষ্য হল 'সার্বজনীন স্বাধীনতা অর্জন করা।' তিনি বলেন যে, যদি অপরের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয় তবে পরতপক্ষে নিজের স্বাধীনতাকেই খর্ব করা হয়। সিমনকে অনুসরণ করে বলা যায় যে,

---

[34] মৈত্র, ২০১৩, *উজানি মেয়ে: সিমন দ্য বোভায়ার-এর জীবন ও দর্শন*, পৃ.১৪১।

[35] Beauvoir. 1948. Translated by Frechtman. *The Ethics of Ambiguity*. P.80.

A freedom which is interested only in denying freedom must be denied. And it is not true that the recognition of the freedom of others limits my own freedom: to be free is not to have the power to do anything you like; it is to be able to surpass the given toward an open future; the existence of others as a freedom defines my situation and is even the condition of my own freedom.[36]

যে স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক সেই স্বাধীনতাকে পরিহার করতে হবে। অন্যের স্বাধীনতাকে স্বীকার করলে তাকে সন্মান করলে নিজের স্বাধীনতা খর্ব হয় না। তা কোনোভাবে কমে যায় না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি আলাদা, প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাধীনতা আছে, প্রত্যেকে নৈতিক কর্মে অংশগ্রহণ করে। তাহলে অনিশ্চয়তার দ্বারা 'সার্বজনীন নীতি' (Universal law) নির্ধারিত হয় কিভাবে? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সিমন এমন নীতির কথা বলেন যা সকলের ক্ষেত্রে 'প্রযোজ্য' বা 'ভ্যালিড'। কিন্তু অনিশ্চয়তাকে অবলম্বন করে তা কিভাবে সম্ভব হবে এই প্রশ্নটি থেকেই যায়। সিমন মনে করেন যে, নৈতিক নীতিগুলিকে সর্বদা সার্বিক, সার্বজনীন (Universal), বিষয়তা (Objective), সকলের জন্য প্রযোজ্য, অবস্থান নিরপেক্ষ - এমন কথা বলার কোনো কারণ নেই। তিনি মনে করেন যে, নৈতিকতার নীতি যদি পূর্বনির্ধারিত নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় তবে নৈতিকতার সীমানা বেঁধে দেওয়া হয়। তিনি মনে করেন যে, নৈতিক

[36] Ibid, P.91.

তত্ত্বের সীমানা বেঁধে ফেলার কোনো কারণ নেই। সিমনকে অনুসরণ করে বলা যায়,

It will be said that these considerations remain quite abstract. What must be done, practically? Which action is good? Which is bad? To ask such a question is also to fall into a naïve abstraction. We don't ask the physicist, "Which hypothesis are true?" Nor the artist, "By what procedures does one produce a work whose beauty is guaranteed?" Ethics does not furnish recipes any more than do science and art. One can merely propose methods.[37]

অন্যভাবে বয়াল যায় যে, তিনি মনে করেন, নীতিতত্ত্ব কেবল একাধিক পথ দেখাতে পারে মাত্র, তদাতিরিক্ত কিছু করতে পারে না। তিনি আরোও বলেন যে, নৈতিক নীতি গুলি যেমন সার্বজনীন নয়, তেমনই যে পরিস্থিতিতে নীতি গুলি গৃহীত হচ্ছে তাও সার্বজনীন নয়। ফলত পরিস্থিতি এবং তজ্জনিত নীতিগুলি পূর্বনির্ধারিত, এমন বলার কোনো কারণ নেই। তিনি পুনরায় বলেন,

Analogically, one may say that in the case where the content of action falsifies its meaning, one must modify not the meaning, which is here willed absolutely, but the content itself; however it is impossible to determine this relationship between meaning and content abstractly and universally: there must be a trial and decision in each case.[38]

[37] Ibid, P.134.
[38] Ibid, P.134.

তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন যে, নীতি গুলি কেবল কয়েকটি পদ্ধতির আভাস দেয় মাত্র। যেমনভাবে একজন ডাক্তার বা একজন শিল্পীর পক্ষে এটি বলা কখনই সম্ভব নয় যে কি পদ্ধতি অবলম্বন করে রোগীকে সুস্থ করা যাবেই বা কোন্ পদ্ধতিতে সুন্দর একটি শিল্পকলা সৃষ্ট হবেই। ঠিক তেমনই তিনি মনে করেন যে নীতিতত্ত্বতেও একটি 'অনিশ্চয়তা'-র পথ রাখতে হবে। প্রকল্প গ্রহন এবং তা নিয়ে চলতে চলতে নির্ধারণ করতে হবে যে, কোন নীতিটি উক্ত পরিস্থিতেতে গ্রাহ্য হবে, কোনটি গ্রাহ্য হবে না। সিমনকে অনুসরণ করা বলা যায় যে,

.....just as the physicist finds it profitable to reflect on the conditions of scientific invention and the artist on those artistic creation without expecting any ready-made solutions to come from there reflections, it is useful for man of action to find out under what conditions his undertakings are valid.[39]

সর্বোপরি অনিশ্চিত মানে অসম্ভব নয়। বরং অনিশ্চিত মানে নির্দিষ্ট নয়, তা সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং সিমনের দর্শনেও পরিবর্তন সর্বদা গ্রাহ্য। সিমনের দর্শনে নানা পরিমার্জনের ছাপ দেখা যায় এবং তিনি তাতে কোনো অসঙ্গতি আছে বলে মনে করেন না।

[39] Ibid, P.134.

The Ethics of Ambiguity গ্রন্থের শেষ দিকে তিনি একটি আপত্তির সম্ভবনার কথা বলেছেন। তিনি যেহেতু 'নৈতিকতা' এবং 'অনিশ্চয়তা'-কে একই রেখায় রাখতে চেয়েছেন তাই এই আপত্তি ওঠার সম্ভবনা আছে যে, এই ধরনের নৈতিকতা কি ব্যক্তিতাবাদী (Individualistic) কি না? তিনি বলেন,

It is individualism in the sense in which the wisdom of the ancients the Christian ethics of salvation, and the Kantian ideal of virtue also merit this name; it is opposed to the totalitarian doctrines which raise up beyond man the mirage of Mankind. But it is not solipsistic, since the individual is defined only by his relationship to the world and to other individuals; he exists only by transcending himself, and his freedom can achieved only through the freedom of others. He justifies his existence by a movement which, like freedom, springs from his heart but which leads outside of him.[40]

যে অনিশ্চতার কথা সিমন বলছেন সেই অনিশ্চয়তা এমন নয় যে, তা ব্যক্তি বা সিমনের নিজের পচ্ছন্দ তাই বলছেন। অনিশ্চয়তা সবসময় থাকবে, তবে আমাদের এই বিষয়ে অবগত থাকতে হবে যে, অনিশ্চয়তা যেন আমাদের গ্রাস না করে। আমারা যেন আমাদের প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে সরে না যাই। ব্যক্তির স্বাধীনতা, প্রকল্প, অবস্থান, অনিশ্চয়তা যেন একই সরলরেখায় অবস্থান করে, একে অপরের থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র নয়। সিমন বলছেন,

[40] Ibid, P.156.

....any man who has known real loves, real revolts, real desires, and real will knows quite well that he has no need to any outside guarantee to be sure of his goals; their certitude comes from his own drive. There is a very saying which goes: "Do what you must, come what may."..... If it came to be that each man did what he must, existence would be saved in each one without their being.....[41]

বলা বাহুল্য যে, সিমন নিজেকে 'দার্শনিক' বলতে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন যে, তিনি নিজে কোনো স্বতন্ত্র দর্শনের অবতারণা করেন নি, কেবল মাত্র সার্ত্রের দার্শনিক কাঠামোকে অনুরসরন এবং অনুকরণ করেছেন মাত্র। নৈতিকতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ *Existentialism is Humanism* এবং *The Ethics of Ambiguity* পড়লে বোঝা যায় যে, সিমন একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক কাঠামো অনুসরণ করে তাঁর দর্শন ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। যদিও সিমনকে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল বোঝা হয় তথাপি আশা রাখা যায় যে, সিমনের বিরল লেখাগুলির পুনর্মুল্যায়ন হলে সিমনের দর্শনের প্রতি ন্যায় বিচার হবে।

[41] Ibid, P.159.

উপসংহার

একথা অনস্বীকার্য যে সিমন একটি অভিনব নৈতিকতার কথা আমাদেরকে বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই ধরনের নৈতিকতা কতটা যুক্তিযুক্ত?

অস্তিবাদী ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নৈতিকতাকে উপস্থাপন করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়। কেননা অস্তিবাদী দর্শনে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির স্বাধীনতা, ইচ্ছা, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক, পরিস্থিতি সাপেক্ষতা ইত্যাদিকে মূল্য দিয়ে কীভাবে কোনো কাজের যথার্থতা বা অযথার্থতা নির্ণয় করা সম্ভব এই প্রশ্নটি ওঠে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, অস্তিবাদী দর্শন যেধরনের নৈতিকতার প্রস্তাব দেয় তা আত্মকেন্দ্রিক নৈতিকতা হবে। নৈতিক পরিসরে অপররের (other) অবস্থান কি বা অপরকে বাদ দিয়ে কি আদৌ নৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা যায় এই প্রশ্নটিও ওঠে। কিন্তু সিমনের দর্শনে ব্যক্তিকে 'স্বাধীন' বলা হলেও 'স্বাধীনতার' একটি পরিধি স্থির করা হয়েছে। সিমন মনে করেন যে, স্বাধীনতার অর্থ যেমন যা খুশি তাই করা নয় তেমনই যদি আমার স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতার হানি করে তাও যথার্থ স্বাধীনতা হবে না। তিনি মনে করেন যে, অপরের স্বাধীনতা হানি করার অর্থ হল নিজের স্বাধীনতাকেও খর্ব করা। পরিস্থিতি সাপেক্ষতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, কেবলমাত্র পূর্বনির্ধারিত নীতি দ্বারা নৈতিকতাকে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি সেই

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবার প্রশ্ন হল তবে অপরের অবস্থান কি হবে? আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এই দার্শনিক পরিকাঠামোয় অপর ব্রাত্য। কিন্তু সিমন নিজের স্বাধীনতা জাহিরের কথা বলতে গিয়ে প্রকল্প গঠনের কথা বলেছেন। অন্য ভাষায়, ব্যক্তি প্রকল্প গঠনের মাধ্যমে নিজের স্বাধীনতাকে জাহির করতে পারে। প্রকল্পের সফলতা বা বিফলতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ব্যক্তির প্রকল্প অন্য ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত হলে তবেই সফল হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল অপরে কিভাবে ব্যক্তির প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবে? সিমনের দর্শন অনুসারে, ব্যক্তি এবং অপর এই স্পষ্ট দ্বিকোটিক বিভাজন সম্ভব নয়। সিমন যখন প্রকল্পের কথা বলেন সেটি আদতে 'আমাদের প্রকল্প' হিসাবেই চিহ্নিত করেন। ফলে অপরকে ছাড়া যে এই নৈতিকতা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। ফলত, আত্মকেন্দ্রিকতা সংক্রান্ত আপত্তিটি ভিত্তিহীন। সুতরাং বলা যায়, সিমনের দর্শন অনুসারে, অপরের অবস্থান এবং ব্যক্তির অবস্থান কি – এই বিষয়টিও অনিশ্চিত। তাই অবস্থানের উপর নির্ভর করে নৈতিকতাও অনিশ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু সমাজে যদি নৈতিকতাকে অনিশ্চিত হিসাবে গন্য করা হয় তাবে সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হতে পারে। তবে এই নৈতিকতা কিভাবে সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে বা আদৌ প্রযোজ্য কিনা তাও গুরুত্বপূর্ণ। অস্তিবাদী দর্শনের পরিকাঠামোয় যেটা মন্দ বিশ্বাস বা ব্যাড ফেথ্-এ করা হচ্ছে সেগুলিকে বেঠিক বলা হবে। মন্দ বিশ্বাসে মানুষ নিজের স্বাধীনতা (Freedom), কর্তৃত্বকে (Agency) উপভোগ করে না। কিন্তু এই স্বাধীনতাকে স্বীকার করা বা না করা

আমদের নৈতিক কাজের নির্ণায়ক নয়। আবার সিমনের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেটা ঠিক তা মিলের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঠিক বা ভুল কোনোটাই নয়। কারণ উপযোগবাদে যে কাজটি বেশী মানুষের জন্য হিতকর সেটা ঠিক। কান্টের তত্ত্ব অনুসারে যে কাজ বুদ্ধি অনুসারে কৃত হবে অর্থাৎ Categorical Imperative-কে অনুসরণ করবে সেটা ঠিক হবে। লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, একটি নৈতিকতার পরিকাঠামো অন্য গুলির থেকে এতই আলাদা যে আমরা বিহ্বল হয়ে যাই। ক-এর দৃষ্টিতে যা ঠিক খ-এর দৃষ্টিতে টা ঠিকও নয়, ভুলও নয়। সমস্ত নৈতিক তত্ত্বগুলি থেকে আমরা কয়েকটা মন্তব্যে উপনীত হতে পারি। সেগুলি হল -

১) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তির স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ।

২) কোনো তত্ত্বেই অন্য কোনো মানুষকে উপায় (means) হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

৩) অন্যের ক্ষতি হোক এরকম কোনো কাজ এই নৈতিকতত্ত্ব গুলি স্বীকৃতি দেয় না।

সনাতনতত্ত্ব গুলি থেকে নারীবাদীরা কোনো কাজ যথার্থ বা অযথার্থ তা নিরূপণের জন্য পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দেয়। অন্যান্য তত্ত্বে যে অর্থে একজন ব্যক্তি স্বাধীন, সিমনের তত্ত্বে ব্যক্তি সেই অর্থে স্বাধীন নয়, বরঞ্চ সিমনের তত্ত্বে ‘স্বাধীনতা’ হল মূল বিষয়। স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির কর্তৃত্ব এই স্থলে প্রধান আলোচ্য।

কিন্তু আমরা জানি যে প্রাত্যহিক জীবনে আমরা মন্দ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কাজ করি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা পিতৃতন্ত্রকে মেনে নি, শান্তির জন্য আমরা তার বিরুদ্ধে যাই না। কিন্তু গিলিগান আর সিমন দুজনেই আমাদের ভূমিকা কি হবে তা স্পষ্ট করে বলেছেন। সিমনের *The Ethics of Ambiguity* এই ঠিক ভুলের দ্বিকোটিক বিভাজন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। মোটাদাগে কোন কাজটি ঠিক কোন কাজটি ভুল আমরা সকলেই তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। সেখানে কোন অনিশ্চয়তা নেই। যদি পুরোপুরি অনিশ্চয়তাকে অবলম্বন করে নীতিবিদ্যাকে স্থাপন করা হয় তবে প্রাত্যহিক জীবনজাপন করা দুঃসাধ্য হবে পড়বে বলে মনে হয়।

সর্বশেষ আলোচনায় বলা যায় যে, অস্তিবাদী দর্শন তথা সিমন দ্য বোভায়ারের দর্শনের প্রধান সমস্যা হল এই দর্শনকে অনেক বেশী ভুল বোঝা হয়। সিমনের অনেক লেখার পুনর্মুল্যায়ন করা হচ্ছে। তাই আশা রাখা যায় যে, ভবিষ্যতে সিমনের দর্শনের যথাযথ বিবেচনা হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

Beauvoir, Simone de. 1948. *The Ethics of Ambiguity*. Translated by Bernard Frechtman. New York: Citadel Press Kensington Publishing Crop.

Bergoffen, Debra B. 1997. *The Philosophy of Simone De Beauvoir Gendered Phenomenologies, Erotic Generosities*. Unite state of America: State University of New York press.

Grene, Marjorie. 1948. *Introduction to Existentialism*. Chicago: Phoenix books The University of Chicago Press.

Macquarrie, John. 1972. *Existentialism*. New York: Penguin Books.

Mohan, joseph. 1997. *Existentialism, Feminism and Simone de Beauvoir*. Great Britain: Macmillan Press LTD.

Moitra, Shefali. 2002. *Feminist Thought.* Kolkata: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.

Mukherjee, Bidisha. 2008. *Redefining Ethics as Care.* Kolkata. Papyrus Publication.

Sartre, Jean-Paul. 1946. Translated by Philip Mairet. *Existentialism Is a Humanism*. 'Fair Use' provision.

Tidd, Ursula .2004. *Simone De Beauvoir*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.

Geetha, V. 2007. *Patriarchy.* Kolkata: Stree.

ঘোষ, ডঃ সঞ্জীব, ২০০৮, *প্রতিভাসবিজ্ঞান ও অস্তিবাদ,* কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

ভদ্র, মৃনালকান্তি, ১৯৯১, *জাঁ-পল সার্ত্রের অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ,* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাসীন,কমলা, ১৯৯৫, *পিতৃতন্ত্র কাকে বলে?,* দেবারতি সেনগুপ্ত ও পারমিতা ব্যানার্জী অনুবাদিত, কলকাতা: স্ত্রী পাবলিশার্স।

মৈত্র, শেফালী, ২০১৩, *উজানি মেয়েঃ সিমন দ্য বোভায়ার-এর জীবন ও দর্শন,* কলকাতা : এবং মুশেয়ারা।

মৈত্র, শেফালী, ২০০৩, *নৈতিকতা ও নারীবাদঃ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা,* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সেন, অমর্ত্য, ২০০৭, *তর্কপ্রিয় ভারতীয় : ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরিচিতি সংক্রান্ত প্রবন্ধমালা.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সরকার, স্বপ্না, ২০১৫, *পাশ্চাত্য দর্শন সমীক্ষা,* কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক।

সরকার, প্রয়াস, ২০০৯, *জ্ঞান, সংশয় ও যুক্তিসিদ্ধি প্রসঙ্গে,* কলকাতা: প্যাপিরাস।

সিংহ, কিংকর, ২০১৪, *দ্বিতীয় লিঙ্গ : সিমন দ্য বোভয়ার*.কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।